প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৬৪

প্রকাশক
মালতী চট্টোপাধ্যায়
সাহিত্য ভবন
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩, মানিকতলা স্ট্রিট
কলিকাতা-৬

দু' টাকা বার আনা

ডক্টর ধ্রুবকুমার দত্ত, এম্. এ , ডি-ফিল্,

প্রিয়বান্ধবেষু

নীলকণ্ঠের অন্যান্য বই

চিত্র বিচিত্র

তারা তিনজন

বসন্ত কেবিন

এক

ননীগোপাল দে ডবল-বি. এ.; অবিবাহিত প্রতিভাবান যুবক।

নিতান্ত বালক-বয়সেই সে তার বিরল প্রতিভার পরিচয় দেয়। প্রথম যে-ঘটনায় তার প্রতিভার সর্বপ্রথম স্বাক্ষর মেলে, তা হ'লো স্কুলে মাস্টারমশায়ের প্রশ্নের উত্তর দানের সময়। মাস্টারমশায়ের প্রশ্ন ছিল: 'সর্বকার্যে দক্ষ যে, তাকে এক কথায় কি বলে'? ক্লাশ সুদ্ধ ছেলে ভাবতে লাগলো; ভাবলো না শুধু ননীগোপাল; ভাবলো না, কাউকে ভাবাল না; সটান উঠে দাঁড়িয়ে জবাব করলো: 'দক্ষযজ্ঞ'! দ্বিতীয়বারের ঘটনাটি অভাবনীয়তায় অদ্বিতীয়। সংস্কৃত জ্ঞানের নমুনা নিতে ননীর বাবা জিজ্ঞেস করেছেন: 'সন্ধি কয় প্রকার'? ননীর তর সয় নি মুহূর্তকাল মাত্রও: 'এক প্রকার'!—জবাব শুনে ননীর বাবা বেশ ঘাবড়েছেন; 'কি রকম'? তিনি একটু অবাক হয়েই যেন আবার প্রশ্ন করেন: 'কি রকম সেই এক-প্রকার শুনি?' বিপুল গর্বে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হয়েই বাবাকে জবাব দিলো ননীগোপাল: 'বয়ঃসন্ধি'! তখন ননীর বয়স সবে মাত্র একাদশবর্ষ।

ননীগোপাল আজও তেমনি আছে কিন্তু। যে-কোনও সমস্যা নিয়ে যখনই তার কাছে গেছি, প্রথমে শুনেই বলেছে, দাঁড়াও না ভেবে চিন্তে কি চট ক'রে সব কথার জবাব দেওয়া চলে? তারপর তিন দিন ধরে ভেবে আসবার পর সেই ননীই বলেছে, অবলীলাক্রমে বলতে পেরেছে: এতে আর এত ভাববার মতো কি হয়েছে? শুনেই অবশ্য আমাদের সব সমাধানই সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে অতঃপর!

ননী শুধু অরিজিনল নয়; এবরিজিনলও বটে।

ননীর সঙ্গে আমাদের আলাপ এই সেদিনের। ননীর বাল্যলীলা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আমরা প্রথম শুনলাম; কে-একজন ছেলে যার সঙ্গেই দেখা হয়, ব'লে বেড়ায় *'When I first came to India'*,—শুনেই আমরা ভড়কাই কিন্তু! তাহ'লে কি আমাদের কোনও সতীর্থর খাস বিলেতে জন্ম। শুনে শ্রদ্ধায় মন আপ্লুত যখন তখনই একদিন ননীগোপালের সঙ্গে আলাপ। ননীগোপাল সত্যই 'ইণ্ডিয়া'-র বাইরে মানুষ;—বর্মায়। জাপানী বোমার তাড়ায় কলকাতায় পালিয়ে এসেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. দেবার জন্যে ফি দেওয়াও যখন সমাপ্ত, তখনই জানা গেল রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ডিগ্রীও তার করতলগত এবং এ কথা কে না জানে যে গভর্ণমেণ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাশে জমা দেওয়া সহজ; সেখান থেকে জমা-টাকা বার করা কিন্তু তেমন সহজ নয়। এমন কি অনেকে নিজেরা তুলতে না পেরে উইল করে দিয়ে যায় (যার থেকে এই ইংরেজি প্রবচনের প্রচলন: *Where there is a will there is a way*). ননীগোপাল এ-সব কিছুই করল না। সে প্রতিভাবান যুবক। রেঙ্গুনের পর আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. ডিগ্রী নেবার পর সে পৃথিবীতে এই প্রথম ডবল-বি. এ. হ'লো।

ননীগোপালের সঙ্গে আর পাঁচজন—সাধারণ নয় অসাধারণ বাঙালীরও কোনো মিল নেই; সে বিশিষ্টদের মধ্যেও বিরল; মুষ্টিমেয় অন্যতমদেরও মধ্যে একক; ননীর তুলনা এই অবনীতে ননী নিজেই। আপনারা জানেন, মাসিক-সাপ্তাহিকের পাতার নীচের দিকটা খালি আছে অথচ সম্পাদকের হাতের কাছে নেই কোন কবিতা, কোন হাজারবার ব'লে পচে যাওয়া রসিকতার চুটকী, তখন সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করা হয় যা ছেপে, সে-লেখার শিরোনামা হচ্ছে, 'প্রথম বাঙালী'! এই শিরোনামার নীচে জানানো হয় অথবা জানতে চাওয়া হয়,

কোন্ দুঃসাধ্য কাজ বাঙালী প্রথম করেছে; কিংবা বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম কে-কবে-কেন-কখন-কী করেছে! যেমন:

কবিদের মধ্যে সাঁতারু; এবং সাঁতারুদের মধ্যে কবি,—কে?

বিজ্ঞাপন নিতে হলে বিজ্ঞাপন-সচিবের লেখাও ছাপতে হবে,—তামাম হিন্দুস্থানে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন,—কে?

বাগবাজার থেকে গৃহপ্রস্থানের পথে হিমালয়-ভ্রমণের প্রথম বাস্তবচিত্র আঁকেন কে?

প্রত্যেক হাসির বইকে দুরূহ এবং দুরূহ অভিধানকে চিরকালের মতো হাসির একখানি চলন্তিকা করতে পেরেছেন কে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার বিপুল, বিচিত্র, মহিমান্বিত জীবনে ননীর এমন দুটি-একটি কীর্তি অক্ষয় হয়ে আছে যাতে ননীকে শুধু 'প্রথম বাঙালীর' পর্যায়ে ফেললে তা অপর্যাপ্ত হবে; তার জন্যে সৃষ্টি করতে হবে একটি নতুন তালিকা, যার দিতে হবে নতুন এক শিরোনামা; 'প্রথম ও শেষ বাঙালী'। অর্থাৎ বাঙালীদের মধ্যে প্রথম নয় শুধু, শেষও! এবং এই নতুন শ্রেণীতে ননী একক এবং অদ্বিতীয়!

যদি বিশ্বাস না করেন, তবুও বলি। ঘোরতর অবিশ্বাসীর পক্ষেও দু'একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। ইস্কুলে বেঞ্চির ওপর দাঁড়ায় ছাত্ররা, কখনও-কখনও ডবল বেঞ্চির ওপর দাঁড়াতেও বাধ্য হয়। কিন্তু কখনও শুনেছেন, কলেজে বেঞ্চির ওপর দাঁড়াতে কাউকে? কখনও শোনেননি এবং আর কখনও শুনবেন নাও। তাই বলছিলাম ননীগোপালই প্রথম ও শেষ বাঙালী যে এই দুর্লভ কীর্তিতে কীর্তিমান।

কলেজে একদিন সংস্কৃতর অধ্যাপক ক্লাসে এসে দেখেন, ননীগোপাল ক্লাসের মধ্যেই ওয়াটারপ্রুফ গায়ে জড়িয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে বসে আছে। অধ্যাপক এসেই স্তম্ভিত এবং কয়েক মুহূর্ত হতবাক। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ননীকে জিজ্ঞেস করেন: তুমি গায়ে ওয়াটারপ্রুফ আর মাথায় ছাতা খুলে বসে আছ কেন ক্লাসের মধ্যে? বিশ্বাস

করুন বহুবিস্ফারিত দৃষ্টিকে কপালে তুলে ননী জবাব করলো : আজ্ঞে, আপনার মুখ দিয়ে বড্ড থুতু ছিটকোয় কিনা।

এবং তার একটু বাদে কলেজসুদ্ধ ছেলে এসে দেখে গেল, এই প্রথম কলেজের বেঞ্চিতে দাঁড়িয়ে আছে একজন ছাত্র এবং তার গায়ে ওয়াটারপ্রুফ, মাথায় ছাতা। বেঞ্চিতে দাঁড়ালেও ননী পেছনের সীটে-বসা ছাত্রদের এতটুকু অসুবিধা করলো না। ননীর হাইট যে চার ফিট দশ ইঞ্চি। ননী অবশ্য প্রায়ই ব'লে থাকে যে বাসে দাঁড়িয়ে যেতে হ'লে তার মাথা বাসের ছাতে গিয়ে ঠেকে। এ-কথা শুনে আমরা যখন সবাই তেড়ে মারতে যাই তাকে তখন সে নিরস্ত করবার কারণেই সমস্ত ব্যাপারটা খোলসা করতে বাধ্য হয়; সে করুণ সুরে গেয়ে উঠে : আ-হা-হা শোন আগে সমস্তটা; দাঁড়িয়ে যাওয়া মানে বাসের সীটের ওপর দাঁড়ালে আমার মাথা বাসের ছাতে গিয়ে লাগে, এই বলতে চেয়েছিলাম।

এই আমাদের ননীগোপাল।

তার মহৎ জীবনের মর্ম কেউ গ্রহণ করতে পারল না, এই তার পরম দুঃখ। শুধু তাই নয়, সবাই তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে সব সময়, এ তার বদ্ধমূল ধারণা; এ জগতে সবাই তার প্রতি শুধু অন্যায় করেছে; সে অসহায়, সে দুর্বল। তাই মুখ বুঁজে সে সব সয়ে চলেছে; এবং আজ নয় যেদিন থেকে তার চোখ ফুটেছে, জ্ঞান হয়েছে সে দিন থেকেই জগৎ-সংসারে সবাই তার প্রতি বিরূপ, সবাই তার শত্রু। কথামালা পড়াবার সময় তাকে সেই বিখ্যাত পালে-বাঘ-পড়ার নীতি-গল্পটি শোনান হ'লো এবং শোনাবার পর জিজ্ঞেস করা হ'লো : বুঝতে পারলে এ গল্পের নীতি কি? ননী মাথা নেড়ে বোঝালো, না। কেন? এতে না বোঝবার কি আছে? একজন রাখালকে আর সব রাখাল গরুর পাহারায় বসিয়ে রেখে বলে যেত, যে গরুর পালে বাঘ পড়া মাত্তর

চেঁচিয়ে সকলকে ডাকতে। মিথ্যেবাদী রাখাল মজা করবার জন্যে প্রায়ই বাঘ না দেখা গেলেও চেঁচাতো আর অন্য সব রাখালরা দৌড়ে এসে মিথ্যে-মিথ্যে হয়রান হয়ে ফিরে যেত। তারপর সত্যি সত্যি যেদিন পালে বাঘ পড়লো এবং সেই রাখাল প্রাণপণ চীৎকার করলো, সেদিন কিন্তু কেউ এলো না, এলো না, কারণ সবাই ভাবলো, রাখাল সেদিনও তাদের সঙ্গে মজা করেছে। এ-গল্পের নীতি হচ্ছে, মজা করবার জন্যেও কখনও মিথ্যা বলতে নেই ;—এবারে বুঝেছ ?

ননী কিন্তু সব শুনেও বললো, না।

যে গৃহশিক্ষক কখনও রাগেন না, তিনিও ক্ষেপে গিয়ে বললেন : 'কেন বোঝনি, বোঝাও আমাকে'। শিক্ষককে ছাত্র বোঝাতে বসলো। 'ধরুন', ননী বললো, 'এই গল্পটাই একটু অন্য রকম ভাবে বললে আপনার উপদেশ কত মিথ্যে হয়ে যায় ভেবেছেন ?' না, এবারে শিক্ষকের মাথা নাড়ার পালা। 'ধরুন', ননী বোঝায়, 'একদল বাঘ একটা বাঘকে বসিয়ে রেখে গেল, গরু পড়লেই চেঁচাতে, যাতে সবাই মিলে এসে খেতে পারে। মিথ্যাবাদী বাঘ রোজ চেঁচায়, গরু না পড়তেই চেঁচায়, মজা করবার জন্যেই শুধু-শুধুই চেঁচায় ; আর বাঘেরা রোজ এসে-এসে নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। তারপর সত্যি-সত্যি যেদিন এসে পড়ে গরুর পাল, সেদিন সেই বাঘের ডাকে সাড়া দেয় না অন্য বাঘেরা। কিন্তু মিথ্যাবাদী বাঘের চীৎকার শোনা যায় তবু ! নিজের *Conscience clear* করবার জন্যেই বুঝি তার এত হাঁক ডাক ! কিন্তু বাঘেরা ভাবে এ সেই বাঘের মজা করাই বুঝি অন্যদিনের মতো ; এবং তখন সত্যি সত্যি মজা ক'রেই সেই মিথ্যাবাদী বাঘ অতগুলো গরুকে অনেক দিন ধ'রে লাঞ্চ আর ডিনার করলো একা-একাই !

গল্প ব'লেই ননী থামলো না ; প্রশ্ন করলো শিক্ষককে : নীতিটা বুঝলেন ? শিক্ষক, না। এ-গল্পের নীতি হচ্ছে এই যে, নীতি শুধু গল্পরই নীতি ; জীবনের কোনো নীতি নেই ! বুঝলেন ? শিক্ষক তেমনি ঘাড়

নেড়ে ব'লে যাচ্ছেন, না। এবং আবার ননী বোঝাতে লেগেছে ঃ আপনার ওই কথামালার আরেক নীতি বলেছে ঃ *Half a loaf is better than no loaf!* অর্থাৎ একদম না পাওয়ার চেয়ে আধা-পাওয়াও লাভ। এই নীতি জীবনে ফলাতে গিয়ে কেউ একটা বড়ো নালা পেরুতে, 'পুরোটা লাফাতে না পারি অর্ধেকটা তো পারব', এই বিশ্বাসে যদি লাফ দেয়, তাহলে তার অবস্থাটা কি হয় বুঝতে পারেন ?

এবারে ননীর শিক্ষক বোধ হয় বুঝতে পারেন ; একটু বেশিই বোঝেন এবার। ননীর বাবার কাছে তখন পর্যন্ত ননীর একাদশতম শিক্ষক জবাব দেন সেই রাত্রেই।

এই ননীগোপাল এখনও সেই ননীগোপাল আছে।

তেমনই নির্বিকার! তেমনই মহিমময়। তেমনই নিজের যুক্তিতে অটল, অচল। এখনও তার সেই এক ধারণা ; কেউ তাকে বুঝলো না। সবাই অন্যায় করলো তার ওপর। সবাই অত্যাচার করলো। সে অসহায়, দুর্বল, শিশু! তাই, তাই সকলের সব কিছু অন্যায়-অবিচার সে সহ্য করলো মুখ বুঁজে!

মাস্টারকে কথামালার নতুন নীতি-বোঝানো ননী যে এখন আর শিশু নেই, শিশুপাল হয়ে উঠেছে ক্রমশ ; একথা ননীগোপাল কিছুতেই মানবে না। তার সঙ্গে আমাদের আলাপ যে হতে না হতেই বরফের মতো জমে উঠলো তার একটা ইতিহাস আছে ; শুধু ইতিহাস কেন, তার ভূগোলও আছে। এখন সেই কথায় আসি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সে-বছর *mock-parliament*-এর আয়োজন হলো ; তখনও দেশ স্বাধীন হয় নি। তখনও বিলাতের পার্লামেণ্টই আমাদের পার্লামেণ্টকে চালায় ; সেই ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে যা যা হয়, তারই ক্যারিকেচর জমে উঠলো এই *mock parliament* মারফৎ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই কেউ চার্চিল সাজলো, কেউ ইডেন কেউ এটিলি। ননীগোপাল সাজলো লর্ড এমেরী। লর্ড এমেরী সেজে ননী বললো ঃ *Even if the Hindoos & Muslims*

are united in India, I am still unafriad. I have then the last triumph-card in my hand, the Communist party of India! ননীর এই উক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্টি-কম্যুনিষ্ট ছাত্ররা বিপুল করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করলো ; কম্যুনিষ্টরা শাসাল ঃ দেখে নেবো এবং কম্যুনিষ্টরা সত্যি সত্যি তার পরের দিন এক হাত দেখে নিলো ননীকে।

ব্যাপারটা ঘটলো এইরকম।

স্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের বার্ষিক উৎসবে ননীগোপাল বললো সে গান গাইবে। ননীকে আমরা কত ক'রে বোঝালাম যে এখানে গান একটু এদিক-ওদিক হ'লেই পচা ডিম থেকে আরও পচা যা কিছু গাইয়ের উদ্দেশ্যে ছোঁড়ে ছাত্ররা এবং তা উপভোগ করে ছাত্রীরা। কিন্তু এসব কথা শোনবার যে সে ননী নয়। সে বর্মা ফেরৎ! সে ডবল বি. এ.! সে মাথায় চার ফিট দশ ইঞ্চি। সদ্য সত্ত লর্ড এমেরী-সাজা।

ইউনিয়নের বার্ষিক উৎসব-সন্ধ্যা তখন সবে জমেছে।

ধুতি-পাঞ্জাবী সামলাতে সামলাতে ননী এসে বসলো গান গাইতে। আমরা সন্ত্রস্ত ; ননী বেপরোয়া। ননীগোপাল প্রথম লাইনটা কেবল মাত্র মাইকে ছেড়েছে ঃ রোদন-ভরা এ বসন্ত। রোদন কথাটা শোনামাত্তর পেছন দিক থেকে হাসির হর্‌রা ছাদে গিয়ে ঠেকল। কিন্তু মাইকের সাম্‌নে ননী তখনও অমায়িক। অরণ্যে রোদন ভেবে শ্রোতারা থামলো। ননীগোপাল যতক্ষণে 'বসন্তে' এসে ঠেকেছে ততক্ষণে মহোচ্ছব সুরু হয়ে গেছে হলের মধ্যে—এবং বসন্ত এসে গেলে শীতের আর কত দেরী—এই প্রবাদবাক্য অনুযায়ী ততক্ষণে নার্ভাস হয়ে ননীগোপালের গলা দুর্দান্ত শীতের দাঁত ঠক-ঠকানো সুরু করে দিয়েছে। গলা কাঁপে, কিন্তু ননীর বুক কাঁপে না। আমরা যত ইসারা করি, 'উঠে আয়' 'উঠে আয়', ননী তত তেড়ে-তেড়ে, উঠে-উঠে বসে। কিন্তু সত্যি আর না,—হলের মধ্যে চেয়ার-ভাঙার

আওয়াজ সুরু হয়ে গেছে। ননীগোপাল অবশেষে এক সময়ে থামতে এক রকম বাধ্য হলো। গান বন্ধ না হ'লে তখন মেশিনগান চলবার অবস্থা।

কিন্তু গান বন্ধ ক'রে উঠে আসবার সময় ননী নার্ভাস হয়ে কি কে জানে, কেন একা না উঠে হার্মনিয়ামটা সুদ্ধ উঠে এলো। হার্মনিয়াম অসৌভাগ্যবশত ননীগোপালের চেয়েও ভারী। টলমল টলমল করতে করতে ননী এলো কোনরকমে উইংগস পর্যন্ত; কিন্তু নেপথ্যে অদৃশ্য হবার আগে স্টেজের ওপরই ধড়াস ক'রে পড়ে গেল,—এবং হার্মনিয়ামটা রইলো তার বুকের ওপর গুরুভার পাথরের মতো। তুমুল হট্টগোলের মধ্যেও ননীর ক্ষীণ কণ্ঠের হাহাকার *Help Help* !-টুকু শোনা গেল ঠিকই। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো গুহ। দৌড়ে গেল সে। তার আগের দিন *mock-parliament*-এ সকলের সামনে ননীগোপাল তাকে সাতিশয় কটুক্তি করেছে। হার্মনিয়ামটা তুলে নিয়ে ননীকে ভারমুক্ত করবার বদলে বরং ননীর বুকে হার্মনিয়মের সামনে গ্যাঁট হ'য়ে বসলো; অনেকটা শাকের আঁটির ওপর আবার বোঝা হ'য়ে; এবং কি আশ্চর্য! চুপ ক'রে ব'সে থাকলো না। হার্মনিয়মে তার হাত আছে যে তাই বোঝাবার জন্যই বোধ হয় বাজাতে লাগলো; আমরা শুনলাম: রোদন ভরা এ বসন্ত···।

কিন্তু শুধু ননীর নয়; ননীগোপালের সমস্ত বংশেরই শুধু ইতিহাস নেই, ভূগোলও আছে। ননীদের বাড়ির মতো বাড়ি সুদূর বর্মা থেকে বাংলা দেশ পর্যন্ত একটাই এযাবৎ দেখা গেছে; একটা দেখা গেছে ব'লেই রক্ষে! না হ'লে হয়তো বর্মা দেশ ভাগ হ'য়ে যেত পশ্চিম বর্মা এবং পূর্ব বর্মিস্থানে আর শরৎচন্দ্র হয়তো বাংলা দেশে চাকরী করতে এসে সমৃদ্ধ করতেন প্রবাসী বর্মিস সাহিত্য। ননীর বাড়ির প্রত্যেকটি লোক বিচিত্র বিশিষ্ট, ও বিরল। ভূ-বর্মা-ভারতে ননীদের মত বংশ আর একটিও পাওয়া অসম্ভব।

ননীর বাবা সম্বন্ধে ননী বলে, *My father loves me almost like his own child* ; ননী সম্বন্ধে, খুসী থাকলে ননীর বাবা বলেন

He is really a grand son ; যখন রেগে থাকেন, বলেন, *He is not a son ; he is a bison !* ননীগোপালের পূর্বপুরুষরা সবাই অপূর্ব এক-একেকটি পুরুষ ! ননীর বাবার কথাই ধরা যাক। তিনি যতদিন চাকরী করেছেন, ধূমপান করেননি কখনও। চাকরী থেকে 'রিটায়ার' করবার পর অবশ্য তিনি অবিরত ধূমপান ছাড়া আর কিছু করেন না।

চাকরী-জীবনে একদিন সকালে অফিস যাবার সময় প্রতিবেশী তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ কী, মিঃ দে ফিরে এলেন যে ? মিঃ দে কিন্তু কথার জবাব দেন না। বিড়বিড় করতে-করতে এগিয়ে যান বাড়ির দিকে। তাঁর বাড়ি থেকে ট্রাম-রাস্তা পর্য্যন্ত ৫৪৯-'পা' তিনি প্রতিদিন গুণে গেছেন ; গুণে এসেছেন। সেদিন ট্রাম-রাস্তা পৌঁছতে গুণে হয়েছে ৫৪৮-'পা'। ব্যস। অফিস যাওয়া মাথায় রইলো। বাকি এক 'পা' কোথায় গেল। সেই *missing link ?* আর এক 'পা' হলেই ৪৯ হয় পুরো। সেই হারানো *step*-টি ফিরে পাবার জন্যে যখন *step-by-step* গুণে ফিরছেন তখন প্রতিবেশীর কথায় জবাব দেবার সময় কোথায় তাঁর ?

ননীগোপালের দুই বোন যেন রবীন্দ্রনাথের এক উপন্যাস। তাদের মধ্যে একজন ভালোবাসে জনৈক চীনেম্যানকে ; অপর বোনের প্রেমিক হচ্ছে একজন জাপানী। একটি বাচ্চা ছেলে দুই বোনেরই প্রেমপত্র নিয়ে যায় প্রেমিকের কাছেই ; চিঠি হস্তান্তর করবার সময় ছেলেটা মানুষ গুলিয়ে ফেলে প্রায়ই। চীনেম্যানকে-লেখা চিঠি দেয় জাপানীকে ; এবং জাপানীকে দেবার লিপি দেয় চীনেকে। তার দোষ নেই ! এ-জগতের যতেক ভুটানী-নেপালী-চীনে-জাপানী এমন কি বার্মিস পর্যন্ত সকলের মুখই, মুখ নয় ঠিক, নাক আর চোখ তার কাছে এক রকম। চীনে আর জাপানী জটিল সমস্যায় পড়ে। বাঙালীদের চিঠি পড়াতে গিয়ে শোনে এ-চিঠি তাকে লেখা নয়, লেখা অন্য কাউকে। চিঠির নীচে প্রেমিকাদের নাম থাকে না মেয়েসুলভ সতর্কতার কারণে। ফলে মন-কষাকষি আবার মধুর হতে সময় নেয়।

নীগোপালের মেজদা' উকীল। কিন্তু ওকালতি ছাড়া আর সবই করেন। জীবনে একটি মাত্র 'কেস' পেয়েছিলেন। একজন ইনসলভেন্সীর নেবার পিটিশন করবার কাজ দেয় তাঁকে। ইনসলভেন্সী-প্রার্থী সেই মক্কেলের ধার হয়েছিল নিরানব্বই টাকা। ইনসলভেন্সী নেবার খরচ একশ' টাকা। ম্যাজিষ্ট্রেট ধারের অঙ্ক শুনে ননীর মেজদা'র ডিগ্রী কেড়ে নেওয়া ছাড়া আর কিছু করতে বাকী রাখেন নি।

ননীর বড়দা' ডাক্তার।

তাঁর সম্বন্ধে যা শোনা যায় তা আরও মর্মান্তিক. তা আরও ভয়াবহ। কোথাকার মহারাজার মা যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন মহারাজা ঘোষণা করেন যে, সবচেয়ে কম রুগী মেরেছে এরকম ডাক্তার দরকার। ননীর বড়দা গিয়ে দাঁড়াতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কত জন রুগী এ-পর্যন্ত সাবাড় করা হয়েছে? 'আজ্ঞে, পঞ্চাশ।'—ননীর বড়দা তখনও ভরসা করেন। মাত্র পঞ্চাশ শুনে মহারাজা ঘাবড়ান। আবার প্রশ্ন করেন; প্র্যাকটিশ কতদিনের? ননীর বড়দা বলেন: আজ্ঞে, গতকাল আরম্ভ করেছি। এরপর কি হয়েছিল, অনেক চেষ্টা করেও তা আর জানা যায় না।

ননীর একমাত্র পিসীমাও ননীদের বংশের ধারাই পেয়েছেন। ননীর আজও মনে আছে, ৺বিজয়ার প্রণাম করতে গেলে, ননীর পিসীমা বলেছিলেন, প্রত্যেকবার দুর্গাপূজার সময় ভাবি তোর দাদাদের সঙ্গে তোকে খেতে ডাকবো; কিন্তু ডাকা হয় না কোনোবারই; ডাকতে ভুল হয়ে যায়। এবারে আবার দেখছি বয়স বেশির জন্যে কি কেন কে জানে, আমারই মন্দ কপাল এবারে আবার ভাবতেও ভুলে গেছি রে!

এরই মধ্যে ব্যতিক্রম শুধু ননীর মা।

তিনি পাগল নন; কিন্তু ছেলেমেয়ে এবং তার সঙ্গে স্বামীকে মানুষ করতে-করতেই তাঁর এই বংশের ধারা পেতে আর দেরী নেই। ছেলেমেয়েরাও একসময়ে সাবালক হ'লো কিন্তু স্বামী রয়ে গেলেন

নাবালকই। এই দুঃখে তিনি এ-সংসারে এসে এমন একদিনও যায় নি যেদিন না হেসে খুন হয়েছেন। এই দুঃখের সংসারে তাঁর কোনো অসুখ হয় নি কখনও। হাসিই হয়েছে তাঁর একমাত্র ব্যয়রাম!

এই বংশের ধারায় বাদ ছিলো যা ননী তাই যোগ করলো ; প্রেমের ধারাপাত। ননী প্রেমে পড়লো। প্রথম প্রেম নয়। তার জীবনের শেষ প্রেম, অবশ্য ননীর মতে প্রেম অশেষ। যেদিন সে প্রেমে পড়লো, তার জীবনের শেষ প্রেমে, সেদিনটার কথা আজও তার মনে আছে। আষাঢ়স্য নয়, এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে। দিনটাকে আরও মনে ক'রে রাখবার মতো কারণ ঘটেছিলো। জীবনের প্রথম দুর্দিন।

দোতলা বাসে করে ফিরছিলো ননী। বাসে বসেই পকেটে হাত দিল সে (নিজের পকেটে)। তখনও বাসে সিগারেট-বিড়ি খেতে দিতো : পকেট থেকে তুলে নিয়ে এবারে মাথায় হাত দেবার পালা তার। একটি সিগারেট ছিল যে, কোথায় গেল ? তাহলে বাসের ঝাঁকানি লেগে পড়ে গেছে এইখানেই কোথাও। নিচু হয়ে খুজতে লাগলো ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু না, কোথাও নেই সেই সিগারেট। একটিও ধোঁয়া নেই ? কী সর্বনাশ! বাড়ী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়,—চোখে ধোঁয়া দেখতে লাগলো ননী। এই একটু আগেও পকেটে ওপর থেকে হাত দিয়ে স্পষ্ট ফিল করেছে সে সিগারেটটা ঠিক আছে যেখানে থাকবার। কিন্তু এখন ?

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো পেছনের সীটে একজন সদ্য ধরানো একটি সিগারেট ঠোঁটের সুখে টানছে। কাঁচি। ননীর নিজের ব্র্যাণ্ড। সদ্য পুত্রশোক অনুভব-করা ননী যে সংস্কৃত বচনের ওপর মনঃক্ষুণ্ণ হলো, তা হচ্ছেঃ 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম্'। আর সব খাবারের বেলায় হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই সত্য; কিন্তু সিগারেটের বেলায় কিছুতেই নয়। ঘ্রাণে তৃষ্ণা বাড়ে। আর এই এপ্রিল, মাসের পড়ন্ত বিকেলে ডবল-তলা বাসের মাথায় চেপে যেতে-যেতে

নিজের একমাত্র সিগারেটটি খুইয়ে, অন্য একজনকে ঠিক পেছনের সীটে বসে তার নিজের ব্র্যাণ্ড ফুঁকতে ফুঁকতে যেতে দেখলে ডবল বাড়ে। ঠিক এই সময়ে সিগারেটের ওপর যে মহাকাব্য লিখতে সুরু করেছিল ননী, তার মঙ্গলাচরণটি তার সেই মুহূর্তে মনে পড়েলা ঃ

সিগারেট! সিগারেট! সিগারেট!
সিগারেট চাই *at any rate*!
গোল্ড্ ফ্লেক-ক্যাপ্স্টন-কাঁচি,
যা-হোক একটা পেলেই বাঁচি;
হুইস্কি-বিয়ার,
হোক যতই ডিয়ার—
গুড়ুক গুড়ুক
যত বুড়োরা ফুঁকুক
নিক নস্যি,
যত দস্যি;
ওরা কেউ কিছু নয়,
জানি শুধু গ্রেট—
সিগারেট। সিগারেট। সিগারেট।
সিগারেট। সিগারেট। সিগারেট।
সবার সমান প্রিয়, কংগ্রেসী-কমরেড।
বড়াসা'ব-কেরানী,
প্রোফেসার-ছাত্তর,
সকলের জানি তুমি,
তুমি প্রিয় পাত্তর;
ঘরে যার চাল নেই
আর যেই করে ব্ল্যাক মার্কেট
সবার সমান প্রিয়, সিগারেট।

গান গাওয়া মাত্রই মাথা একেবারে সাফ। ফন্দী এসে গেল। ছেলেবেলা থেকেই মাথা খুলতে একটু দেরী হয় ননীর ; কিন্তু একবার খুললে আর রক্ষা নেই। সোডার বোতলের মতো যত বুদ্ধি সব ভস্‌ভস্‌ করে বেরিয়ে পড়তে থাকে। মনে-মনে মতলব এঁটে ফেললো সে ; পেছনে সীটের ধূমপানরত ভদ্রলোকের কাছে প্রথমে দেশলাইটা চাইবে ; হাতে পেয়েই সঙ্গে-সঙ্গে ফেরত দিতে যাবে ; ভদ্রলোক নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন, 'সিগারেট ধরালো না কেন ননীগোপাল'। তখন ননী বলবে যে সে ভেবেছিল তার কাছে বুঝি সিগারেট আছে, কিন্তু ধরাতে গিয়ে দেখছে যে নেই, তখন? তখন সেই ভদ্রলোক কি আর ভদ্রতার খাতিরে তাকে একটা সিগারেট ধার দেবে না? নিশ্চয় দেবে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজে নামা।

দেশলাই নিয়েই দেশলাই ফেরত দিতে ভদ্রলোক ঠিক ননীর ধারণা অনুযায়ী জিজ্ঞেস করে বসেছেন : কী হল সিগারেট ধরালেন না? ননী ঠিক তার প্ল্যান মতো উত্তর দিলো : ভেবেছিলাম সিগারেট আছে, এখন ধরাতে গিয়ে দেখছি নেই। সঙ্গে-সঙ্গে ভদ্রলোক পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলেছেন নিন, নিন, আমার কাছ থেকেই নিন। কিন্তু সেই মুহূর্তে ননীর বিবেক বাধা দিলো। দ্বারিক ঘোষের দোকানে বাঁধিয়ে রাখা বিবেকানন্দের বাণী মূর্ত হয়ে উঠলো চোখের ওপর : চালাকির দ্বারা কোন মহৎকার্য করা যায় না। ভদ্রলোক যত বলেন নিন, নিন ; ননীগোপাল ততই বলে : না, না ; বাসের মধ্যে সে এক সিন।

নিলো না বটে ননী সিগারেট কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনে হ'লো, নিলেই হত। সে কিছু মহাত্মা গান্ধী নয় যে তার *End* এর মতো *means* এরও মহৎ হতে হবে। এইসব ভাবছে আর আড়চোখে আবার তাকাচ্ছে পেছনের দিকে। ঠিক সেই সময়ে, 'এই কি গো শেষ টান' বলে ভদ্রলোকের যেই সিগারেটের অন্তিম-অংশটুকু জানালা গলিয়ে ফেলা আর, ননীর সব সংযম ভেসে যাওয়া।

ননী আর পারলো না ; হেসে ফেল্‌লো। হাসতে হাসতেই পেছনের ভদ্রলোককে বললোঃ দিন, দাদা দিন, আপনার একটা সিগারেট দিন, আর পারা গেল না।—শুনে ভদ্রলোকও হাসতে থাকেন ; হাসতে হাসতেই ব্‌লেনঃ তাহলে আমাকেও এবারে সত্যি কথাটাই বলতে হয় ; দাদা আমার কাছেও আর 'সগারেট ছিলো না, আমিও আপনার মত শুধু অভিনয় করছিলাম, যে ি-'গারেটটা আমাকে খেতে দেখেছেন, প্রকৃতপক্ষে ওটাও কি বলে গিয়ে আমার কেনা নয়, এইখানেই কার পকেট থেকে বোধ হয় পড়ে গিয়েছিল, কুড়িয়ে পেয়ে টানছিলাম।

'ও'। ননী চোখের জল ফেলবে কি হাসবে ভেবে পেল না। তার যে সিগারেটটা সে খুঁজে পায়নি, সেটা তা হ'লে—।

জীবনের পরম দুর্দিন সেদিন সত্যই।

ইউনিভার্সিটির মোড়ে সিগারেটের দোকানে ননী সিগারেট কিনলো বটে কিন্তু মুখে ধরালো দেশলায়ের কাঠিটা। সিগারেটওলা স্তম্ভিত, সে কি যেন বললো, ননীর কানে গেল না সেকথা, পৃথিবীর পরমাশ্চর্য এক মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে উল্‌টো দিকের ফুটপাথেই।

দেশলায়ের কাঠিটা ঠোঁটে চেপে ধরে, সিগারেটটা দেশলায়ের বাক্সে বারুদের গায়ে ঘষতে ঘষতে ননী মনে-মনে যা বললো, পথচারীদের কানে গেল তা'। চেঁচিয়ে বলে ফেলেছিল ননীগোপাল, মানসী।

হ্যাঁ, পৃথিবীর রমণীয়তম সেই রমণীর নাম মানসী মল্লিক। স্বপ্ন দেখতে লাগলো ননীগোপাল, *Mid-Summer day-dream*। চাঁপা-ফুল-রঙ শাড়ীর সঙ্গে কোথায় যেন এই মেয়ের গায়ের রঙের আশ্চর্য মিল। সমস্ত মুখখানায় চোখে পড়বার মতো মানসীর চোখ দু'টো। রাত্রির মতো কালো দুটো চোখ রাস্তার ভীড়ে ভালো করে মেলতে পারে না মানসী ; তার বড় বড় দুটো চোখ যেন কার স্বপ্নে আর কিসের লজ্জায় জড়সড়, আধ-বোঁজা, আধ-খোলা। ঘন চুলের থোকা সারা পিঠ জুড়ে এলোমেলো ছড়ানো। মুক্ত রাখবার

মত মেয়ের চলা, সেখানে ঘুম থেকে এক্ষুনি জেগে উঠার যত আলস্য একটি মধুর মোহের মত জড়িয়ে আছে সারাক্ষণ। কণ্ঠস্বর ঘণ্টার মত নিটোল, ননী শুনেছে এর আগেই! ঘণ্টার মত বাজলেই নেশার মত ঝিমঝিম করে যে শোনে তার সমস্ত ইন্দ্রিয়। ননী স্বপ্ন দেখতে দেখতেই অদৃশ্য হল মানসী মল্লিক। স্বপ্ন শেষ হল, শুধু স্নায়ুতে স্নায়ুতে ননীগোপালের তখনও বেজে চল্‌ল, রিম রিম! রিম রিম!

মানসীকে ননীগোপাল এর আগে একবার দেখেছে!

তখন অবশ্য ননী জানতনা যে তার নাম মানসী, জানতনা যে মানসী মল্লিকও বিশ্ববিদ্যালয়েরই পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। সেই না জানা, না দেখা মেয়ের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাত পূর্ণ থিয়েটারে। শো তখন সবে মাত্র শেষ হয়েছে। ঘরের কিছু আলো জ্বলেনি। সেই আবছা আলো অন্ধকারে মানসী মল্লিকের মুখের আধখানা দেখা গেল আর আধখানা দেখা গেল না। আর সেই মুহূর্তে মরে গেল ননীগোপাল।

একটু আগেই সিনেমা দেখতে আসবার সময়ে সে ভেবে রেখেছিল শো শেষ হ'লে তার মামাকে সে একচোট নেবে আজ। কিন্তু মামাকে নেবে কি সে নিজেই চোট খেল সেই মারাত্মক জায়গায়,—যেখানে জুলিয়েতকে দেখে চোট খেয়েছিল রোমিও, লাবণ্যকে দেখে অমিতের বেজেছিল যেখানে, এক কথায় বাঙলা ছায়া ছবিতে নায়িকাকে দেখবার আগেই নায়ক যেখানে হাত বুলোতে থাকে,—অর্থাৎ সাদা বাংলায়, তীর এসে লাগল সোজা বুকে!

সেই দেখার পর আজ এই দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ—ননীগোপাল দে, ডবল-বি, এ-র জীবনে অদ্বিতীয় হয়ে রইল। বাড়ী ফিরে সে রাতে ননী শুতে গেল কিন্তু ঘুমতে পারল না। সেই প্রথম না ঘুমোতে পারা রাতে ননীগোপাল তার ডায়েরীতে একটি নূতন কাব্যের জন্ম দিল!

এতকাল জগজ্জন মনসা-মঙ্গল পালাই শুধু জানত ; ননীগোপাল সে-রাতে গাইলো : মানসী-মঙ্গল ! ডায়েরীতে করে রাখল তার মঙ্গলাচরণ :

পচা পৃথিবীকে যেতে দাও পচে,
ভেঙ্গে হোক না সে চুরমার !
কালো চোখ আরো কালো কর্‌তে যে
প্রয়োজন শুধু সুর্মার !
খোলা থাক মেয়ে জানলার কাঁচ,
পড়ুক না রোদ পিঠে সে,
বোশেখী গরম আগুনের আঁচ,
তাও যে লাগচে মিঠে সে ;
এসো তবে আজ পড়া যাক প্রেমে,
এসো দুরন্ত ময়ূরি !
আমাদের কথা যদি যায় থেমে
বলুক না কথা ও চুড়ি !
মঙ্গলগ্রহে লাভ নেই জানি,
শয্যা বিছাই চাঁদের তলে —
মঙ্গলগ্রহ সইবে না রাণী
আমাদের মত 'অমঙ্গলে' !
পচা পৃথিবীকে যেতে দাও পচে
ভেঙ্গে হ'ক না সে চূরমার !
কালো চোখ আরো কালো করতে যে
প্রয়োজন শুধু সুর্মার !

মানসী মল্লিকের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী মালতী মিত্রর সঙ্গে আলাপ ছিল ননীগোপালের। মালতীর সঙ্গে ননীগোপালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রহ্লাদ দত্তের আজ বছর কয়েক ধরে চেনা ; সেই সূত্রেই ননীর সঙ্গে মালতীর আলাপ ছিল সামান্য। সেই সামান্য আলাপ এখন অসামান্য প্রলাপে

গড়াল। প্রলাপ বকল ননীগোপাল; প্রলাপ বকল যার কথা নিয়ে তার নাম মানসী মল্লিক।

মালতীকে একদিন ওয়াই-এম-সি-এ বাড়ীর নীচের রেস্তোরাঁর কেবিনে ননীগোপাল চা খেতে-খেতে বলল: একজনের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে হবে?

কার সঙ্গে? মানসী মল্লিক তার নামতো?'—মালতীর চোখের কোণে দুষ্ট-বুদ্ধির ছুরি ঝিলিক দিয়ে উঠল।

ঢোক গিললো ননীগোপাল: এঁ্যা-হ্যাঁ, তাই—আপনি জানলেন কি করে,—মানে আমার এমন কিছু—"

"ওরকম দেখা হ'লেই 'হাঁ' করে তাকিয়ে থাকলে সবাই জানতে পারে!"

"হাঁ-করে আমি তাকিয়েছি? দেখেছেন আপনি?"

"না, আমি দেখিনি"—মালতি এবারে হাসিতে ফেটে প'ড়ে বলল: তবে মানসী বলছিল—"

"মানসী বুঝি না দেখেই বুঝতে পারল,"—এবার ননীর পালা: "ওঃ তাহলে বোঝাই যাচ্ছে আমি একাই দেখিনি—মানসীও ছিল দেখবার ব্যাপারে,—'হাঁ' করে না দেখুক, আড়-চোখে চেয়ে দেখেচে অন্ততঃ!—কী বলেন?"

এইভাবে কথার পিঠে কথা, পিঠপিঠ কথা কাটাকাটির মারাত্মক খেলা কাটিয়ে উঠে ননীগোপাল মালতীকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিল যে, মালতী, মানসীর সঙ্গে ননীর আলাপ করিয়ে দেবে।

যাবার সময়েও মোক্ষম কথাটা বলে যাবার লোভ সামলাতে পারল না মালতী,: "দেখবেন, আলাপ ত' করিয়ে দেব, সুরুতেই প্রলাপ বকতে আরম্ভ করবেন না।"

ননীগোপাল দাঁড়িয়ে রইল; মালতী চলে গেল।

কেমন যেন সেই মুহূর্তে নিজেকে ইডিয়ট ভাবতে ভারি ভালো লাগলো তার। সে যে নাতিদীর্ঘ, মাত্র চার ফিট, দশ ইঞ্চি মাথায়,

এই প্রথম তার মনে হল, একজনের চোখে হয়ত সে সত্যিই এত ছোট রইবে না আর। বন্ধুরা যে তার চেহারায় কথাবার্তায় হাঁটাফেরায় শুধু বোকামী ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পায় না, এ-জন্যেও তার বন্ধুদের ক্ষমা করে দিতে এই মুহূর্তে ননী এক মুহূর্ত দ্বিধা করল না।

কিন্তু মালতীর অপেক্ষায় না থেকে ননীগোপাল নিজেই এগুল।

সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে যারা জানে তারাই জানে লক্ষ্য ভেদের কায়দা। ইউনিভারসিটি-লিফ্‌ট থেকে বেরুচ্ছে তখন মানসী মল্লিক। ননীগোপাল ক্লাশ পালিয়ে রেস্তরাঁয় খেতে যাচ্ছিল। এমন সময় ওদের দেখা মুখোমুখী। ননীর তখন মুহুর্মুহু হৃৎকম্প হতে থাকলেও, বারবার মানসীর গাল লাল হয়ে যেতে থাকলেও এবং তা লক্ষ্য করেও ননীর সমস্ত গোলমাল হয়ে যেতে থাকলেও সে বুঝল, এই হ'ল সময়। ইতিমধ্যে মালতীর মারফৎ মানসীর যা খবর পাওয়া গেছে তাতে বাতাস যে অনুকূলেই বইছে, এ-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ঠিক সময়ে নৌকা ভাসাতে না পারলেই ত' সব বেঠিক হয়ে যায়!

তাই ননী আর দেরী করল না।

মানসীকে সোজাসুজি বলল: এই যে, আপনার সঙ্গে আমি আলাপ করতে চাইছি, আর আপনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন?

মানসীর মস্ত বড় কালো চোখের পাতা জোড়া কাঁপছে।

ননী তাই দেখে মানসীকে বলল: আপনার নাম মানসী,—তাই কি এ রকম ছেলেমানুষী করে আরাম পান আপনি?

এবারে মানসী মুখ তুল্‌ল: "দেখুন, এ-সব ব্যাপারে আমি বিশেষ অভ্যস্ত নই।"

"কি মুশকিল?" মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ করে ননীগোপাল বল্‌ল: "আলাপ জিনিসটাকে অভ্যেসে দাঁড় করানর মত অরুচিকর আর কিছু নেই।"

ননী এরই মধ্যে কখন 'হাঁ' করে আবার দেখছে মানসীকে। আশে-পাশের ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে দেখছে ওদের। তাই দেখে মানসী এতক্ষণ দেখছিল ননীকে, সে আর চোখ তুলে তাকাতে পারছে না।

ননী জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার কি ক্লাশ আছে, মিস্ মল্লিক ?

'হ্যাঁ',—খুব আস্তে জবাব দিল মানসী ঃ ডাঃ দাশগুপ্তর ক্লাস।"

"কী হবে ক্লাশ করে, আসুন না কোথাও গিয়ে বসা যাক!" ননী একটু জোর দিল গলায়।

"না, আজ থাক, অন্য দিন হবে; এইমাত্র বাইরে থেকেই আসছি।" ননীগোপাল তখন মনে-মনে ভাবছে আর এগুবে কিনা! প্রথম দিনেই যদি বিগড়ে যায় মেজাজ তা'হলে মুশকিল হ'বে।

একদল ছেলে এসে চাঁদা নিল মানসীর কাছ থেকে। ননী ভাবল এদের কানে যদি কোনও কথা গিয়ে থাকে তার, তাহলে চাঁদা করে মার খাওয়া আছে তার কপালে!

ছেলেরা চলে যেতে কি হ'ল ননীর, সে বলে বসল ঃ আমার জন্যে কি একদিন ক্লাশ কামাই করতে পারেন না আপনি ?

মানসীর মনে সেদিন কি ছিল কে জানে!—রাজি হয়ে গেল সে!

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল ওরা দু'জন—! ঘড়িতে তখন ঠিক দুপুর দু'টো!

ননীর সব চেয়ে বড় বন্ধু প্রহ্লাদ দত্ত।

ননীর মতে তার সব চেয়ে *hostile*-বন্ধু! সেই প্রহ্লাদের কাছে ননী তার মানসীর কথা সব বলে ফেলল। এই দশবারের বার ননী যে এবার সত্যিকারের প্রথম প্রেমে পড়েছে, এ-সম্বন্ধে তার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই; প্রহ্লাদকেও সে এবার নিঃসন্দেহ হ'তে বলল। বলল ঃ এর আগের ন'বার যা সে সত্যি বলে মনে করেছিল, তা' যে একদম ভুয়ো, এতদিনে সে তা' বুঝতে পেরেছে। নয় নয় তারা;

ননীর জীবন নয়-ছয় করে দেবার জন্তেই হয়েছিল তাদের আবির্ভাব। এবারে শূন্যের আগে একের মত এসে দাঁড়িয়েছে একাই ননীর জীবন পূর্ণ করে ভ'রে দেবার জন্তে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী মানসী মল্লিক।

প্রহ্লাদকে দিয়ে বার বার বলিয়ে নিল ননীগোপাল, যেন একথা সে তৃতীয় ব্যক্তির কাছে না বলে; ফাঁস না করে যেন কোন প্রকারেই। প্রহ্লাদ ননীর কথা রাখবার জন্যই কি না কে জানে, শুভেন্দুকে ত' বললই, তা'ছাড়া চতুর্থ ব্যক্তির কানে তোলবার জন্য হাঁসফাস করতে লাগল। শুভেন্দুই সেই বন্ধুকৃত্য করল, একাধিক লোকের কানে না তুলে একজন স্ত্রীলোকের কানে তুলে দিল; আরাধনার কানে; এবং পইপই করে বারণ ক'রে দিল, খবরদার যেন আর কেউ না জানে। মেয়েদের পেটে কিছু থাকে না, এই ভরসাতেই শুভেন্দুর আরাধনাকে সব বলা। এবং আরাধনার কল্যাণে কিছুদিনের মধ্যেই সেই গোপনীয় কথা অত্যন্ত গোপনেই ইউনিভাসিটিময় ঘুরতে লাগল।

মানসীর সঙ্গে ননীর শেষ কথা হয়েছে সেই অধ্যাপক দাশগুপ্তের ক্লাস পালিয়ে যেদিন ওরা দুপুর দু'টায় নেমে গেছে ইউনিভার্সিটির সিঁড়ি দিয়ে; সেই প্রথম এবং সেই শেষ! কিন্তু আরেকবার কথা হয় কি ক'রে? কোন কথার ছলে চালানো যায় আরও কথাবার্তা? আলাপই যদি ভাল ক'রে না জমে, ত' প্রলাপের সুযোগ আসবে কোথা থেকে? ননীগোপাল গেল মালতীর কাছে; মানসীর ব্যাপারে প্রহ্লাদ হচ্ছে *Friend, Philosopher & misguide*। তার চেয়ে মালতী ঢের ভরসাযোগ্য।

যাওয়া মাত্র মালতী জানাল: "*You are too late,*—মানসী জানাতে বলেছে আপনাকে!"

"*Never mind! better late than never!*" একটুও ঘাবড়ালনা ননী। মালতী হাসল; তারপর বলল: তা ত' বুঝলাম!

—কিন্তু দিলীপকে প্রাণের কথা না বললে প্রাণ বাঁচছিল না কি ?—সমস্ত খবর সবাইকে না জানালেই নয় ?—না ।"

'কেন ? দিলীপও কি—?'

'হ্যাঁ. দিলীপও' ; ননীকে কথা শেষ না করতে দিয়েই কথা স্নুরু করে মালতী ; "দিলীপের প্রাণও ওই পায়েই সমর্পিত ।" কথা সারা করে সে, দফা-সারা করে ননীগোপালকে !

মনে পড়লো ননীগোপালের সব। এই সেদিন,—দিলীপকেও সব কথা বলেছে সে-ই ; দিল্ খুলেই বলেছে সব। অথচ দিলীপ তাকে বলেনি একটি কথাও। আশ্চর্য ! বলবে কোথা থেকে ? দিলীপ ত' নিজেই লিপ্ত ষড়যন্ত্রে। ছেলেগুলোকে বোঝাও তার ! এই সেদিন পর্যন্ত দিলীপ ইতিহাসের রোগা আর বেঁটে, বিচ্ছিরি সেই মেয়েটার জন্যে হাঁস-ফাঁস করে মরছিল। এরই মধ্যে 'দৃষ্টি' এতদূর গেছে ? এঁ্যা ? দিলীপের দূরদৃষ্টির প্রশংসা করতে বাধ্য হয় সে।

মালতী-ই আরো খবর দিল ঃ "দিলীপ এরই মধ্যে কবিতা পাঠিয়েছে।"

"মিল দিয়ে ?" প্রশ্ন করল ননীগোপাল।

"হ্যাঁ, মিল দিয়েই ; গোঁজামিল দিয়ে নয় গদ্য-কবিতার !'

হায়রে ! কপাল চাপড়ে, ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল ননীগোপালের ; এ-কবিতাটাও যে ননীকে দিয়েই দিলীপ লিখিয়ে নিয়েছে। একবারও যদি বলত, কার কাছে পাঠাচ্ছে।

ওদিকে আজ সারাদিন ধরে প্রহ্লাদ দত্ত ননীকে সাবধান বাণী শোনাচ্ছে ঃ *Look before the leap* ! কিছুতেই ননী বুঝতে পারে না, প্রহ্লাদ কার সম্বন্ধে সাবধান করতে চায়। অবশেষে এক সময়ে ননী-ই প্রহ্লাদকে বললো ঃ 'চল্ বেরুনো যাক্'। প্রহ্লাদ তার সেই বিখ্যাত 'একমিনিট দাঁড়া' বলে সকাল এগারোটার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্রেটারীর কাছে গেল। বহুদিন কোনও স্ট্রাইক হয় নি ; মঙ্গলবার দিন তিনি ষ্ট্রাইক করতে অনুমতি দেবেন কি না, সেই কথা

জানতে। ননী একবার বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে স্ট্রাইক করবার অনুমতি পাওয়া যায় না! কিন্তু প্রহ্লাদের মতে জানিয়ে রাখা কর্তব্য বলেই, সে যাচ্ছে। বেলা সাড়ে তিনটের সময় সেক্রেটারীর ঘর থেকে বেরিয়ে ননীকে তখনও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটুও লজ্জিত না হয়ে বললোঃ "তুই এখনও দাঁড়িয়ে? চল্ চল। একটু দেরী হয়ে গেল, না?"

ননী কিছুই ধললো না; তারই দায় যে!

প্রহ্লাদ জিজ্ঞেস করল ঃ কি ব্যাপার? চট করে সারো; তোমার সঙ্গে সারাদিন কাটালে চল্‌বে না! ননী বললো ঃ প্রহ্লাদ, তোমার সঙ্গে ভয়ঙ্কর দরকার। ননীর আপ্যায়ন আমলের মধ্যে না এনে বললো ঃ তার চেয়ে ঢের বেশী দরকার আমার কিছু খাওয়ার : ক্ষিধে পেয়েছে কিনা!

"চলো, চলো; খেতে-খেতেই বলা যাবে! ক্ষিদে পেয়েছে, সে-কথা বলতে হয়! খাওয়ার কথা সব সময় আমাকে বলবে, খাবার সময়ই ত' কথা বলতে আরাম!"—অত্যন্ত উদার মনে হল ননীগোপালকে এই প্রথম। এবং প্রহ্লাদের উদর তখনকার মত ননীকে তার জন্যে পেটে-পেটে ধন্যবাদ জানাতে চাইল (মনে মনে বলা অসঙ্গত হয় না? উদরের কি মন থাকে?) রেস্তোরাঁয় ঢুকে প্রহ্লাদ দত্ত নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করলো।

নিজেই অর্ডার দিল : ফাউল কারী দাও এক প্লেট আর মোগলাই পরটা নিয়ে এস চট করে! হ্যাঁ, তারপর তুমি কি বলতে চাইছিলে?

ননীগোপাল ঃ লুক বিফোর দি লিপ,—ব'ল তুমি কি বোঝাতে চাইছ?

প্রহ্লাদ ঃ তুমি খাচ্ছ না কেন?—এই বয় আর একটা পরটা দাও।

ননী ঃ লুক বিফোব দি লিপ,—বলে তুমি কি বোঝতে চাইছ?

প্রহ্লাদ ঃ এ-দোকানের চিংড়ীর কাটলেট খেয়েছ?—খাওনি? দাড়াও, দু'খানা দিতে বলছি। হ্যাঁ, কি বলছিলে?

ননী ঃ লুক বিফোর দি লিপ ব'লে তুমি কি বোঝাতে চাইছ?

প্রহ্লাদ ঃ পুডিং দাও এবারে ; পুডিং-এর পর আইসক্রীম দেবে ; কী আইসক্রীম তুমি নেবে ননী ? টুটি-ফুটি ? না অর্ডিনারী ?

ননী ঃ লুক বিফোর দি লিপ ব'লে তুমি কি বোঝাতে চাইছ ?

প্রহ্লাদ ঃ এখানকার বিল মিটিয়ে দিয়ে তুমি এস ; মিষ্টির দোকানে ঢুকে রাবড়ি খাব ; বহুদিন খাওয়া হয়নি।

বিল নয়, রেস্তোরাঁর বয় যা নিয়ে এল তার নাম খাল।

মিষ্টির দোকানে রাবড়ী খাবার আগে, প্রহ্লাদ দু'জনের জন্য গরম কচুরী আর আলুর দমের অর্ডার দিল, তারপর জিজ্ঞেস করল ননীকে, হ্যাঁ কি বলছিলে ?

ননী ঃ লুক বিফোর দি লিপ ব'লে তুমি কি বোঝাতে চাইছ ?

প্রহ্লাদ ঃ কচুরী গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নাও।

ননী হয় ত' আবার তার প্রশ্নের পুনরুক্তি করত ; করা হ'ল না।

বাচ্চা ছেলে একটা খাবার দিচ্ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ আমার পাতে চারটে আলুর দম আর ওর পাতে (প্রহ্লাদের পাত দেখিয়ে) পাঁচটা আলুর দম কেন রে ?

প্রহ্লাদ বিজয়গর্বে হাসছিল। বাচ্চা ছেলেটা বলল ঃ চারটে করে দিয়ে দেখলাম আলুর দম ফুরিয়ে গেছে, একটা পচা মত ছোট আলু ছিল, দিয়ে দিলাম ওর পাতে।

প্রহ্লাদ বিষম খেল, ভীষণ বিষম! তিন গ্লাস জল খেয়ে তবে ঠাণ্ডা হল প্রহ্লাদ। ননীর মুখে হাসি দেখা দিল এতক্ষণে।

হাসার সঙ্গে সঙ্গে ননীর চোখে ভাসা ভাসা একটা অর্থ যেন ধরা দিল। জিজ্ঞেস করল ঃ লুক বিফোর দি লিপ বলতে মানসী সম্পর্কে কোনও সাবধান বাণী করছ কি ? প্রহ্লাদ 'হ্যাঁ' বলা মাত্তর ননীর চীৎকার ঃ ইউকেরা ! ইউকেরা। প্রহ্লাদ খুব আস্তে ননীকে *correct* করল ; ইউকেরা নয় ইউরেকা ! ননীর এবারে চীৎকার ইউরেকা বলে। 'লুক বিফোর দি লিপ'।—ননী বললো, বুঝেছি, দিলীপ, দিলীপ চৌধুরীই আমার সর্বনাশ করবে।

বোঝার পর সোজা ননী বেরিয়ে পড়লো দিলীপের উদ্দেশ্যে। প্রহ্লাদকে বলে গেল প্রহ্লাদেরই ভাষায়ঃ এক মিনিট দাঁড়া, আমি আসছি। ননীগোপাল দে ডবল বি.এ., প্রহ্লাদের উত্তরের অপেক্ষায় এক মুহূর্তও দাঁড়াল না।

দিলীপ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়-'শ্রী'। ছ'ফুটের ওপরে দু-ইঞ্চি! বুকের ছাতি, মহেন্দ্র দত্তর ছাতা খুললে যা হয় তার কাছাকাছি। দিলীপের কব্জি পাঠান-*wrist*-এর চেয়েও চওড়া; হাত-ঘড়ির বদলে তাতে টেবল-ঘড়ি মানায় বেশী। মেয়ে-ভোলান নয় শুধু ভুবন ভোলান চেহারা নিয়ে এসেছে দিলীপ চৌধুরী। দিলীপ চৌধুরীর পাঞ্জাকে দিলীপের জর্দার চেয়ে বেশি চেনে লোকে। জর্দা বেশি খেলে মাথা ঘোরে মাত্র। দিলীপের পাঞ্জা কারুর গালে গিয়ে পড়লে, দুনিয়া সুদ্ধ সব ঘোরে! দিলীপ চৌধুরী *rival* হ'লে, ননীগোপাল ত' ছেলেমানুষ, অষ্টম এডওয়ার্ডের *arrival* সম্পর্কেও যে-কোন মেয়ে উদাসীন হ'ত!

সেই-দিলীপের কাছে ননী গিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল।

দিলীপ চৌধুরীকে ননী অনেক করে বোঝাল: "আগেকার দিনে ডুয়েল-লড়া ছিল, এখন ত' আর সম্ভব নয়।" দিলীপ গোঁয়ার সে বলল: "কিন্তু সম্ভব নয় কেন? আমি এখনই ডুয়েল লড়তে রাজি আছি তোমার সঙ্গে!"—ষাঁড়ের সামনে পড়ে গেলে লোকে শেষ চেষ্টা হিসেবে যেমন হেসে পাস কাটাতে চায়, তেমনি দৈত্য প্রমান-সাইজের নিতান্তই চাষাড়ে দিলীপের ডুয়েল লড়ার প্রস্তাব চার ফিট দশ ইঞ্চি ননী হেসে উড়িয়ে দিল।

'ঠাট্টা করছ কেন?' ননী জিজ্ঞেস করল। তারপর প্রস্তাব করল: "তার চেয়ে আরেক ধরণের ডুয়েল লড়া যাক; ইনটেলেক-চুয়্যাল ডুয়েল!"

'কি রকম শুনি?'—দিলীপের প্রশ্ন।

'এই ধর,' একটা সিগারেট দিলীপকে ধরিয়ে দিয়ে ননী বলল: তুমি মানসীর কাছে গিয়ে আমার প্রশংসা করবে আর আমি মানসীর

কাছে তোমার! তাতে যার দিকে মানসীর মন গলে, তোমার দিকে ঝুঁকলে আমি সরে আসব; আমার দিকে ঝুঁকলে তুমি, "কি রাজি ত' ?"

"রাজি!" দিলীপ বলল: তোমাকে প্রথম প্রশংসা করতে হবে আমার!

Done! হাতে-হাত দিয়ে বলল ননী।

একঘণ্টা বাদে খাবারের দোকানে ফিরে এসে বলল: প্রহ্লাদ তুই এখনও বসে আছিস? চল, চল। একটু দেরী হয়ে গেল আসতে, না?

প্রহ্লাদ কিছুই বলল না, ইতিমধ্যে সে আরও তিন টাকার খেয়েছে।

কিন্তু কেমন করে মানসী মল্লিকের সঙ্গে কথা হয় অত? কেমন করে ননীর সঙ্গে তার আরেকবার সাক্ষাৎ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কোথাও!

একটা চান্সের অপেক্ষায় আনচান করতে থাকে ননী। সুযোগ এসেও যায়। দুর্য্যোগের ছদ্মবেশে আসে সুযোগ! সব দুর্যোগের জন্যে আমরা যাকে দায়ী করি সেই সর্বশক্তিমান অদৃশ্য শক্তিই জুটিয়ে দেন এই সুযোগ!

ব্যাপারটা অনেকটা ঘটল এই রকম।

প্রহ্লাদ দত্তের জন্মদিন ছিল ১লা এপ্রিল। ঐ তারিখে নেমন্তন্ন করলে, কেউ ভরসা করে যেতো না বলে, প্রহ্লাদ ১লা এপ্রিলের খাওয়াটা পৌষ মাসে করত। পৌষ মাসে করবার কারণ ছিলো একটা। পরের সর্বনাশ করবার জন্যেই নাকি কারুর কারুর পৌষ মাস। আমাদের দিতে হতো পৌষ মাসে এপ্রিলের খাওয়া খেতে যাওয়ার প্রাইস,—মোটা-উপহার অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে, প্রহ্লাদ দিত সাপ্রাইস, কোনওবার কফি, কোনওবার রাধা-বল্লভী, কোনওবার সরবৎ। আর যদি সে কোনওবার জানতে পারতো যে আমরা

অতীতের অভিজ্ঞতার দরুন বাড়ীতে মাকে হাতে পায়ে ধরে একটু জেগে থাকবার জন্যে বলে এসেছি তাহ'লে প্রহ্লাদও সেবারে তার ওখানে পাত পেড়ে খাওয়ার জন্যে হাতে পায়ে ধরতে বাকী রাখতো না!—এবং শেষ পর্যন্ত খাওয়াতোও! ধোঁকার ডালনা ছানার তরকারী, কাঁচকলার চপ এবং পাকপ্রণালী ছাড়াও আরো যত প্রণালী জানা আছে তেতো রাঁধবার (বছরের সব-দিন আমিষ এবং জন্মদিনে, যেদিন বন্ধুদের খেতে বলবে সেদিন শুধু নিরামিষ এই হচ্ছে নাকি প্রহ্লাদের বাড়ীর কুলপ্রথা!)—সেদিন আমাদের ভাগ্যে প্রহ্লাদের বাড়ীতে নিরামিষ এবং বাড়ীতে ফিরে থাকতো গালাগাল খাওয়া!

এমনই এক জন্মদিনে প্রহ্লাদের বাড়ীতে আমরা কুলপ্রথা ভঙ্গকরে যত প্রকার আমিষ (প্রহ্লাদকে বাদ দিয়ে, সেকথা বলাই বাহুল্য!) খেয়েছি। খাবার পর ননী বেরিয়েছে প্রহ্লাদের গাড়ীতে গঙ্গার ধার হ'য়ে আমাদের এক বন্ধু, রাজুকে শ্যামবাজারে নামিয়ে তারপর ননী, ননীর বাড়ীতে নেমে যাবে, এই মতলব করে!

'পেট্রল নেই!'—কুল (প্রথা)-ত্যাগী প্রহ্লাদ বিষণ্ণমুখে জানিয়েছে।

'পেট্রল কিনে নেবো কোথাও থেকে!

টাকা নেই!

'টাকা আমি দেবো, ননীর সদর্প জবাব! —এবং তারপর নিষ্প্রমগ প্রহ্লাদের সোনার তরীতে রবিঠাকুরের নিরুদ্দেশ যাত্রায়!

প্রহ্লাদকে যেমন বিষ খাইয়ে, আগুনে ফেলে দিয়ে, শেষ পর্যন্ত কিছুই করা যায়নি সেযুগে, এ-যুগে তেমনি প্রহ্লাদের সেই বিখ্যাত মোটর গাড়ী সব ধাক্কা সয়ে তখনও জীবিত! গাড়ী চোরেরা চিঠি লিখে জানিয়েছে, এ-গাড়ীতে চাবি দেবার দরকার নেই! দলের প্রত্যেকের কাছে নোটিশ বেরিয়ে গেছে, (*Beware of Pralhad's Car!*): পুলিশে ভয় দেখিয়েছে ও গাড়ীতে 'চাপা পড়লে, ফরিয়াদীর ফাইন হয়ে যেতে পারে!

ইনসিওরেন্স কোম্পানীর বলাই আছে গাড়ী চালু রাখতে পারলে খরচা তারা দিয়ে যাবে, অচল হলে টাকা দেবে না তারা (অর্থাৎ প্রহ্লাদ ইনসিওরেন্স কোম্পানী থেকে তখন প্রিমিয়াম পাচ্ছে !)

তখন রাত বারোটা এবং প্রহ্লাদের গাড়ীর বারোটা তার আগে থেকেই। ননী ও প্রহ্লাদ ড্রাইভার আর তার পাশের সীটে। রাজু বসে পেছনের তিনজনের সীটে একা। গল্প হচ্ছিল প্রহ্লাদের গাড়ী সম্পর্কেই। ইডেন-গার্ডেনে রাজুরা গেছিলো খেলা দেখতে, লাঞ্চের সময় ঐ-গাড়ীতে করে ননী প্রহ্লাদ আর রাজু শুধু যদি চেপে আসতো, তাহলেও কোনও গোলমাল ছিল না, রাজুর এক পৃষ্ঠপোষক (রাজুকে প্রচুর ছাপার কাজ দেন ভদ্রলোক) প্রতুল মুখুজ্জেকে (প্রতুল নয় আসলে ভদ্রলোক যেরকম রোগা তাতে তাঁর নাম হওয়া উচিত ছিলো প্রচুর মুখুজ্জে !) জোর করে গাড়ীতে তুলে যাওয়া হোলো বেঙ্গল রেস্তোরাঁয়। লাঞ্চের পর গ্রাউণ্ডে ফিরেই বাধলো মুস্কিল। প্রচুর, সরি প্রতুল মুখুজ্জে লাঞ্চ খাবার পর।

আরোও রোগা হওয়ায় গাড়ী থেকে আর তাকে টেনে বার করা যায় না। প্রহ্লাদের গাড়ীর দরজা আবার খোলে না। স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খুলতে হয়—আর না হয় দরজা ধরে বসে যেতে হয়। সেদিন স্ক্রু-ড্রাইভার আনা হয়নি তাড়াতাড়িতে—এদিকে দরজাও বন্ধ, বাধ্য হয়েই, কারণ নাহলে প্রচুর মানে প্রতুলবাবুকে গাড়ীতে আটকে রাখা মুস্কিল। ছোট একটা টুল থাকতো গাড়ীর মধ্যে সেটাকে দরজার রাস্তার ওপর রাখা হোল, হুড খুলে প্রথমে ননী প্রহ্লাদ, রাজু তিনজনে চেষ্টা করে না পেরে—রাস্তা দিয়ে ঝাঁকা মুটে যাচ্ছিলো ষণ্ডামার্কা তাদের ডাকলো; তারা বল্ল, দুই টঙ্কা দেবাক হেবো—হঁ ! আচ্ছা হেবো ত' হেবো—এখন কাজকর দেখি রাজু ধমকে উঠলো।—না আমেমানে কিছু শুনিবি নি—কেতে মোট্টা অচ্ছন্তি বাবু— ! —সারাদিন আউর কোন কাম-অ করি পারিবি মুই ?—দুই টঙ্কা না দেবে ত চলি পারিবি কাঁই ?

মাঠের ভেতর লোক, মাঠের বাইরে প্রহ্লাদের গাড়ীর সাম্নে জমল তার চেয়ে বেশি লোক। কিন্তু বার করলো প্রতুলকে টেনে টুনে তারা। তাতেও কিছু হোত না, কিন্তু রাজুর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল *Comfortable* কিন্তু যাই বলো প্রতুল !—ব্যস আমরাও বুঝলাম, রাজুও বুঝলো—পরের মাস থেকে কাজ বন্ধ—প্রতুল মুখুজ্জে এরপর ছাপার কোন কাজ দিলে, এক ে াট ছাপার কাজ দেবে, যা ছাপলে রাজুব জেল। রাজু ত' ছাপবার চেষ্টা করবেই কিনা, —হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা তার রীতি বিরুদ্ধ !

যাই হোক ইতিমধ্যে গল্প করতে করতে গাড়ী কখন এসে পৌছেছে পার্ক স্ট্রীটের লাল নীল হলদে আলোর সাম্নে। লাল দেখে গাড়ী থেমেছে —পাশে এক সাহেবের গাড়ী থেকে একজন সাদা চামড়া কি যেন বল্লে ;

ননী বল্লে *what* ?

An excellent car !—সাহেবরা জলে ছিল, হেসে খুন, গাড়ী দেখে !

ননী ফের এবারে জবাব দিল—*Yes this car & Congress started together* !—*1875* !

লাল থেকে হলদে থেকে সবুজে গাড়ী আবার হাঁটতে আরম্ভ করলো প্রহ্লাদের !

এবারে আবার কথাবার্ত্তার ধারা পাল্টালো। কার কার নাম ইতিহাসে থাকবে তাই নিয়ে কথা পাড়লো প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ আর ননী একমত হ'ল, তাদের দুজনেব নামই থাকবে।—তবে রাজুরটা সন্দেহজনক, কারণ রাজু ঠিক এক সীটে তাদের সঙ্গে না বসে পিছিয়ে আছে—পেছনের সীটে বসে।

তবে প্রহ্লাদ তাকে একবারে নিরাশ করাটা ভালো দেখায় না বলে আশা দিলো—ইতিহাসে না থাকলেও তোর নাম ভূগোলে থাকবে রে !' বলতে বলতে বলতে রাজু চেঁচিয়ে উঠল, "সাম্নে গাড়ী।"

প্রহ্লাদের গাড়ী থেকে সে গাড়ী তখন আধ মাইল দূরে—এখন প্রহ্লাদের গরুর গাড়ী—কাজেই ভয় নেই, ননী ভাবলো। কিন্তু প্রহ্লাদ ততক্ষণে আরম্ভ করেছেঃ *can I—yes—I can* —(তারপর আরোও কাছে এসে) —*I cant—yes—can I* (ফের আশা হয়েছে কাটিয়ে যেতে পারবে—) *No—I cant* (ফাইন্যালি)—গাড়ী লড়িয়ে দিলে এক বিরাট লরির সঙ্গে প্রহ্লাদ।

প্রথমটা আওয়াজ—তারপর কুচকাওয়াজের মত গাড়ীর হুড ভেঙ্গে পড়ল, দরজা খুলে গেল, কাঁচ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে রইল, লরীর মাথায় ছিলো বাঁশ এসে পড়ল প্রহ্লাদের হুডের ওপর থেকে প্রহ্লাদের মাথার ওপর। চাকা খুলে বেরিয়ে গেছে তখন। রাজু সীট থেকে মেঝেয় পড়ে গেছে গাড়ীর।

ইতিমধ্যে ওয়্যারলেস ভ্যান এসে হাজির।

প্রহ্লাদ তখন চেঁচাচ্ছেঃ *I am lossing my consciousness*—তারপর মাথায় হাত দিয়ে দেখে, মাথা ফেটে সেখানে রক্ত বেরুচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে গোবরও! —দেখে প্রহ্লাদ চেঁচিয়ে উঠল তবে কি সত্যই আমার মাথায় গোবর আছে?

ওয়্যারলেস অফিসার বল্লে—সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ আছে, কারণ লরীর থেকে ছিটকে পড়া বাঁশের গাঁয়ে লেগে থাকা গোবর কি আপনার মাথার ভেতরকার গোবর—

প্রহ্লাদ আবার চেঁচাতে লাগলো ঃ *I am losing consciouness.*

লরীর ড্রাইভার কোথায়?—অফিসার জিজ্ঞেস করলেন?

দূরে ননী দাঁড়িয়েছিল—তার পরনে সেই বার্মিস হ্যাফ-প্যান্ট—পায়ে জুতো নেই (ছিটকে গেছে)—একজন সেপাই তার হাত পাকড়াতেই—ননী চেঁচালে প্রহ্লাদ আমাকে ধরেছে যে!

প্রহ্লাদ তখনও চেঁচাচ্ছে ঃ *I am losing consciousness*।

জানা গেলো লরীর ড্রাইভার পালিয়েছে।

তারপর রাজুকে, প্রহ্লাদের গাড়ীকে সেখানে রেখে ওয়ারলেস ভ্যানে করে প্রহ্লাদকে নিয়ে চলল অফিসার হাসপাতালের দিকে; গাড়ীর পেছনের দিকে ননী একা আধডজন বন্দুকধারী সেপায়ের সঙ্গে বসে।

গাড়ীর ঝাঁকানিতে ঘুমন্ত সেপাইদের হাতের বন্দুক অনবরত ননীর শরীর লক্ষ্য করে। ননী হাত দিয়ে আত্মরক্ষা করে। এক জন সেপাই হঠাৎ সজাগ হয়েই চীৎকার: এঃ বন্দুক খিঁচতা ক্যয়?

ননী কোনরকমে বললে—কেয়া খিঁচতা—প্রাণ খাঁচাছাড়া হোতা যে।

হঠাৎ ননীর কানে এলো যে প্রহ্লাদ এতক্ষণ—*I am losing consciousness* বলে চেঁচাচ্ছিল, সে পুলিশ অফিসারকে প্রশ্ন করছে এর জন্যে কত *damage* পাব?

পুলিশ অফিসার তার উত্তরে জিজ্ঞেস করলেন: এই গাড়ীর জন্যে?

প্রহ্লাদকে নিয়ে যাওয়া হল এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে।

সেই চিকিৎসালয়ে যাওয়া নাকি যমালয়ে যাবারই মত প্রায়। তার একদিকে, ভাল লোক বলে, সাইন-বোর্ড আছে: CHARITABLE HOSPITAL! এবং অন্যদিকের সাইনবোর্ড CHARITABLE BURNING GHAT!

প্রহ্লাদের ফাটা-মাথা সেখানে সেলাই হ'ল।

বাড়ী গিয়ে প্রহ্লাদ শুয়ে পড়ে বল্‌ল এখন বিশ্রাম নিতে হবে একমাস। বাড়ীতে প্রহ্লাদ দত্ত বিশ্রাম নেয় আর অবিশ্রাম ভিসিটর আসে। বাড়ীর লোক ব্যাতিব্যস্ত। প্রহ্লাদের মা-বাবা সন্ত্রস্থ, ছেলে ভিজিটরের চেয়ে মেয়ে ভিজিটর সংখ্যায় বেশী যে!

সেইখানেই এক সন্ধ্যায় মানসীর সঙ্গে ননীর আবার সাক্ষাৎ! এবং মানসী ভারি অবাক হ'ল যখন দেখল ননীগোপাল একসিডেণ্টের কথা তুললো না; প্রহ্লাদের কথা তুললো না, এমন কি নিজের কথা না। এবং মানসী হতবাক হ'ল যখন এসবের বদলে ননী জিজ্ঞেস করল:

"দিলীপকে আপনার কেমন লাগে ?

মানসী বলল ঃ ওঁর গলা খুব মিষ্টি আর বইয়ের মধ্যে আমার তীর্থঙ্কর খানা খুব ভাল লাগে, অন্য বইগুলো বুঝতে পারি না!

আমি পণ্ডিচেরীর দিলীপ রায়ের কথা বলছি না,—আমাদের ইউনিভারর্সিটির দিলাপ চৌধুরীর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে ?

হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকে!

ননী বল্‌লে, দিলীপ বড় ভাল ছেলে, যেমন পড়াশুনোয়, তেমনি গান বাজনায়!

মানসী বললে, পড়াশুনোয় ত খুব ভাল নন, গতবার ইক্‌নমিক্সে ফেল করে আবার পড়ছেন! গানবাজনা করেন বলে ত' জানি না। একই পাড়ায় আমরা থাকতাম। ওঁদের বাড়ী আর আমাদের বাড়ীর মাঝখানে ছিলো শুধু ছোট একটা পার্ক!

ননী এবারে বললে, দিলীপ ফুটবল খেলতে পারে জানেন ?

হ্যাঁ শুনেছি কলেজের হয়ে একবার নেমেছিলেন গোলে খেলতে, পাঁচ গোলে যেবারে কলেজ হেরে যায়!

দিলীপের আসল প্রতিভা ছিলো অবশ্য ছবি আঁকায়—কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে আঁকা!

হ্যাঁ, সেই একবার কোন ইস্কুলের মেয়েদের ছবি আঁকতে গিয়ে ধরা পড়ে, রাষ্টিকেট হতে হতে বেঁচে যাবার পর থেকেই, উনি আর ছবি আঁকেন না!

দিলীপের বাড়ীর অবস্থা কিন্তু খুব ভাল!

তাহ'লে ওঁর বাবা জ্যাঠামশায়ের কাছে প্রায়ই আসেন কেন, ছেলের একটা চাকরী করে দেবার জন্যে—আমার মনে হয় তুমি ভুল জানো!

"কিন্তু ছেলেটার সাহস আছে খুব—"

"তা আছে, ওঁর বাবার নাম সহি করে একরার পেন্‌সেনের টাকা তোলবার দুঃসাহস হয়েছিল,—অনেক করে সেবারে ওঁর জেল এবং ওর বাবার পেন্‌সন বাঁচে!

"গায়ের জোরে কিন্তু দিলীপের সঙ্গে পারা শক্ত—"

"মেয়েদের পক্ষে তাই বটে, ওঁর ছোট ছোট বোনেরা সে কথা বলত'।"

"দিলীপের সততা কিন্তু সন্দেহের ওপর!"

"হতে পারে, তবে উনি পাড়ার সর্বজনীন পূজোয় ট্রেজারার ছিলেন একবার—তারপর থেকে উনি ক'মিটিতে থাকলে পূজো হবে না বলে ছেলেরা জানানোর পর—উনি আর সেদিকে ঘেঁসেন না!"

কিন্তু এরপরেও কেন যে ননীগোপাল নিজের কথা না বলে, দিলীপের কথাই বলে চলল, মানসী বুঝতে পারলো না কিছুতেই। বুঝলো তার পরের দিন।

যখন দিলীপ এসে একেবারে গায়ে পড়ে শুরু করে দিলেঃ ওই বেঁটে তালপাতার সেপাইটার সঙ্গে তোমার আবার কবে থেকে আলাপ হ'ল?

কোন "সেপাই-এর সঙ্গে আমার আলাপের দরকার কী!—আমি ত' আর বিনা টিকিটে ব্যাড়া টপকে খেলা দেখতে যাবো না ময়দানে!

আমি বলছি "ননীর সঙ্গে, ননীগোপাল দে বার্মাফেরৎটার সঙ্গে তোমার আলাপ হ'ল কবে?"

"অনেকদিন, জেল ফেরতের সঙ্গে হলে না হয় একটি 'আপত্তি উঠত', বার্মাফেরতের সঙ্গে আপত্তিটা কোথায়?

"ও ত' হাইটে মেয়েদের ঘাড়ের কাছে!

"যারা হাইটে মেয়েদের মাথা অনেক ছাড়িয়ে, তাদের ত' দেখলাম মেয়েদের পায়ের কাছে লুটোপুটি খেতে!

ওর মধ্যে তুমি কি দেখলে?

"দেখলে ত' মিশতেই পারতাম না,—ওর মধ্যে প্রিটেনশান, দম্ভ গায়ে পড়া-ভাব দেখলাম না বলেই মিশতে পারছি এখনও"।

"সেবারে গান গাইতে গিয়ে কিরকম কেলেঙ্কারী করলে মনে আছে? প্রিটেনশান নেই বলছ?

“গান না গেয়েও যেসব কেলেঙ্কারী তোমরা কর, সেগুলির তুলনায় ও কিছু নয়! তাছাড়া গান গাইতে উনি বেশ ভালই পারেন, একটু নার্ভাস এই মাত্র।

এরপরেও দিলীপ চৌধুরী কেন যে ননীগোপালের ওপর ঝাল ঝেড়েই চলল আধঘণ্টা ধরে মানসী অনেক ভেবেও বুঝতে পারলো না।

বুঝতে পারলো ননীগোপাল, যখন দিলীপ চৌধুরী এসে বল্লে: প্রাণ ধরে তোর প্রশংসা করতে পারলাম না ননী—! তবে মানসী তোমারই—*You are her Man! Good Luck* ননী, ডবল বি, এ-ত' তোমার হয়েই গেছে ট্রিবল বিয়ের বেলায় নেমন্তন্ন করবে ত'?

ননী গলে গেল মাখনের মত টুপ ক'রে।

দুই

মানসী মল্লিকের মা-বাবা কেউ বেঁচে নেই।

এ-সংসারে তার জ্যাঠাবাবুই সব। জ্যাঠাবাবুর নাম, চমৎকার মল্লিক। জ্যাঠাবাবুর নিজের ছেলেমেয়ে অনেকগুলি। কিন্তু যাকে তিনি সব চেয়ে ভালবাসেন সে তাঁর নিজের সন্তান নয়। তার নাম মানসী। মানসীর নিজের ভাই-বোন নেই। থাকার মধ্যে আছে এই বাড়ীর অংশ। আর আছে বাবার রেখে যাওয়া সামান্য টাকা। চমৎকার মল্লিক যে নিজের ছেলে-মেয়ের চেয়ে মানসীকে বেশি ভালবাসেন এই কারণটাই মানসীর প্রতি মানসীর জেঠিমাকে বিরূপ হতে বাধ্য করেছে। কারুর প্রতিই তিনি খুসী নন; মানসীর প্রতি তাঁর অমানুষিক আক্রোশ। তাঁর নাম শুধু রঙ্গিনী হ'লেও, একটু

আড়াল-আবডাল পেলেই লোকে বলত: ওই যে রণরঙ্গিনী দেবী আসছেন, এখন চলি।

কিন্তু চমৎকার মল্লিক, সত্যই চমৎকার লোক।

চমৎকার মল্লিকের পেশা হচ্ছে আড্ডা দেওয়া; এবং নেশা হচ্ছে ব্যবসায় লোকসান করা। আত্মীয়েরা পরামর্শ দেয় প্রায়ই দু'টোর একটা রাখতে; একটা তুলে দিতে। চমৎকার মল্লিক তাতে রাজী নন। তিনি বলেন এক নৌকায় পা দিয়ে ডোবার নজীর নেই ইতিহাসে; ডুবতে হ'লে দু'নৌকায় পা দেওয়া চাই। এবং দু'নৌকাই ফুটো হওয়া দরকার। তবে ডুবতে-ডুবতেও চমৎকার একটা কাজ করেছিলেন। যে দু'নৌকায় তিনি ভাসবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করতেন সর্বদাই সেই দুই ফুটো নৌকার কোনটাই কিন্তু জলে নয়, দাঁড়িয়েছিল ডাঙাতেই। কাজেই চমৎকার মল্লিক একেবারে ডুবে যাবেন, এ-ভয় ছিল না। অর্থাৎ তাঁর আড্ডা এবং ব্যবসা দু'য়েতেই ডোবা এত অল্প-অল্প ক'রে যে এ-জীবনটা তোফা কাটিয়ে যাওয়ায় তাঁর সন্দেহ ছিল সামান্যই; অন্য লোক ছিল নিঃসন্দেহ!

চমৎকারের নয় বন্ধু। এক বন্ধুই জীবন নয়-ছয় করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু জন্ম-প্রহ্লাদ মার্কা চমৎকার মল্লিকের নয় বন্ধুতেও কিছু হয় নি। অনেকে তাঁকে সাবধান করতে এসেছে তাঁর নয় বন্ধু সম্পর্কেই; বলেছে ওরা আসলে বন্ধু নয়। চমৎকার মল্লিকের তবুও তেমনি নয় বন্ধু সহযোগে নবরত্ন সভা আলো ক'রে বসা সকাল আটটা থেকে বারোটা। সন্ধে ছ'টা থেকে রাত দশটা। এ-আড্ডায় শনি-রবি নেই; নেই পাবলিক বা রিপাবলিক কোন হলিডেই।

এই নবরত্ন সভার সবাই পুরুষ। কিন্তু নয়ের ওপর সম্প্রতি আরেকজন এসে প্রমাণ করেছে যে বাকী নয় আসলে কিছু নয়; সে হ'ল রমণী। রমণী কোন মহিলা নয়; রমণী হ'ল রমণীমোহন, বিল্ডিং কন্‌ট্রাক্টর। তার কথাই সেদিন নব-রত্ন সভায় আলোচনা হচ্ছিল। এমন সময় ননীগোপালকে নিয়ে সেই সভায় এল মানসী।

মানসী তার জ্যাঠার সঙ্গে ননীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো ঃ ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়ছেন।

চমৎকার মল্লিক বল্‌লেন ঃ বোস।

ননীগোপাল বসে-বসে নবরত্ন সভা দেখতে লাগল।

চমৎকার বলছিলেন ঃ দেখ দেখি কি অন্যায় রমণীর? বাড়ী মেরামত আরম্ভ করবার সময় বলেছিল, বারশ' টাকায় হয়ে যাবে; এখন অর্ধেক মেরামত হয়নি, অথচ চার-পাঁচ হাজার টাকা গলিয়ে দিয়েছে!

প্রীতিপ্রদ আচার্য শুনে বললেন ঃ খুব অন্যায়!

চমৎকার মল্লিক ঃ এখন রমণী কি বলছে জানেন? বলছে গোড়ায় বুঝতে পারেনি; কাজ আরম্ভ করবার পর খোঁড়া-খুঁড়ি ক'রে দেখতে পাচ্ছে, বাড়ীটার আর কিছু ছিল না, তাইতেই—

প্রীতিপ্রদ ঃ ঠিক বলেছে রমণী, গোড়ায় কি আর সব বোঝা যায়?

চমৎকার ঃ কুলীরা বলছে, বাড়ীর যে-অংশ সবচেয়ে মজবুত, সে অংশটা ভেঙ্গে ফেলেছে রমণী; আর যে অংশ মেরামত করা দরকার সেটায় হাত লাগায় নি।

প্রীতিপ্রদ ঃ এটা অন্যায় করেছে রমণী।

চমৎকার ঃ রমণীকে সে কথা বলতে, রমণী তার উত্তরে কি বললো জানেন? রমণী সোজা আমার মুখের ওপর বলে গেল, কুলীরা জানে কি?—শুনলেন?

প্রীতিপ্রদ ঃ তা রমণী বলতে পারে বৈকি! সত্যিই কুলীরা যদি জানবে, তাহ'লে কন্‌ট্রাক্টর না হ'য়ে ওরা কুলী কেন?

চমৎকার ঃ তারপর শুনুন! কুলীরা বলছে তারা টাকা পায় নি, অথচ রমণীর এক পয়সা বাকী নেই আমার কাছে,—গরীবদের টাকা তাহ'লে আটকে রাখা রমণীর অন্যায় নয়?

প্রীতিপ্রদ ঃ একশ'বার অন্যায়! ওই ক'টা টাকা ঘরে নিয়ে গেলে তবে ত' খাবে।

চমৎকার : রমণী আবার তার ওপর তড়পাচ্ছে ; বলছে, নেমকহারাম বেইমান,—আটচল্লিশ টাকা বাকী মাত্তর, তার জন্যে বাবুর কাছে লাগান ?

প্রীতিপ্রদ : মাত্তর আটচল্লিশ টাকার জন্যে বলাটা অবশ্য কুলীদের পক্ষে বেইমানাই হয়েছে ; কত আটচল্লিশ তারা এতকাল ধরে রমণীর কাছে পেয়েছে ত'।

চমৎকার : আমি মশাই, সোজা কথার লোক। রমণীকে ডেকে খুব গা'ল মন্দ ক'রে বলেছি, কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর এক পয়সাও পাবে না।

প্রীতিপ্রদ : তা' তোমার না দিলে অন্যায় হয় না, তোমার কাছে নিয়ে হয়ত অন্য জায়গায় খরচা ক'রে ফেলবে। তখন কুলীরা কাজ বন্ধ করলে বাড়ী মেরামত আর এগুবে না। দিও না ওকে আর এক পয়সাও দিও না—

চমৎকার : তাই শুনে, রমণী বলেছে পয়সা না পেলে সে-কাজ এগুবে না।

প্রীতিপ্রদ : ঠিক। ব্যবসাদারের মতই কথা ! পয়সা না পেলে করবে কোথা থেকে ?

চমৎকার : ভাবছি, টাকা দেব বলে রমণীকে একদিন ডেকে এনে খুব উত্তম-মধ্যম ঠেঙ্গাই !

প্রীতিপ্রদ : এ তোমার মত মরদের উপযুক্ত কথা। তোমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন জমিদার ; সেই বীরের রক্ত যাবে কোথায় ? ওকে ঠেঙ্গাও একদিন।

চমৎকার : কিন্তু যদি মামলা করে ?

প্রীতিপ্রদ : করে মানে ? মামলা করাই রমণীর কর্তব্য হবে। তুমি টাকাও দেবে না, মারতেও চাইবে,—শুনবে কেন রমণী ?

ননীগোপাল প্রায় হেসে ফেলেছিল, কোন রকমে সামলাল !

নব-রত্ন সভার সবচেয়ে প্রবীণ সদস্যের নাম মুক্তহরি দে-সরকার। মুক্তহরির বয়স বাষট্টি। মাথায় প্রকাণ্ড টাক ; একটি শুধু কালো

চশমার অপেক্ষা,—পরলেই চক্রবর্ত্তি রাজাগোপালাচারীর মত চেহারা। চশমাটি খুলে ফল্‌স্‌ টিথ পরলে কিন্তু শিবরাম চক্রবর্তির মত। অন্য সবাই যখন কথা বলে তখন তিনি মুখ বুঁজে থাকেন। একবার সবাই চুপ ক'রলে তিনি মুখ খোলেন কিন্তু মুখ আর বন্ধ করেন না। সেই জন্যে নব-রত্ন সভায় নিয়ম আছে অলিখিত যে একজন কথা শেষ করলেই অন্য জনকে ধরতে হবে। না ধরতে পারলেই মুক্তহরির-বোল আরম্ভ হ'লে সেদিনকার মত সব শেষ।

সেদিনও চমৎকার মল্লিক এবং প্রীতিপ্রদ দু'জন অনেকক্ষণ ধরে প্রশ্ন বিচার গণনার পর একটু শ্রান্ত হয়ে চুপ করেছিলেন। অন্যেরা হতবাক হয়েছিলেন প্রীতিপ্রদর অপূর্ব বিচার পদ্ধতিতে; মুহূর্তকাল মাত্র। ব্যস, মুক্তহরি আরম্ভ ক'রে দিলেন, তবে শোন—। ননী-গোপাল দেখল নবরত্ন সভার সকলের মুখ কেমন কালো আর করুণ হয়ে গেল হঠাৎ।

মুক্তহরি কিন্তু ততক্ষণে জমিয়ে সুরু করেছেন।

অনেকদিন আগে একটা প্রচণ্ড হাসির কথা বলেছিলেন আমার বন্ধু উলুবেড়ের জমিদারবাবু নৃসিংহনারায়ণ,—আজ সেই গল্পটাই বলবো। অনেকদিন আগের ঘটনা বলে ঠিক পর-পর মনে নেই, তবে যতটা সম্ভব আসলের কাছাকাছি রাখবার চেষ্টা করবো।

গল্প আরম্ভ করলেন বেলা এগারটায়।

আমি আমার সেজছেলে ন্যাপলা আর নৃসিংহনারায়ণ তখন ফেণীতে নৌকায়,—এই পর্যন্ত বলে মুক্তহরি ঘোঁক ক'রে একটা আওয়াজ ক'রে বললেন: উঁহু ফেণীতে নৌকায় ত' নয়,—আমার বাড়ীতে খাটের ওপর—। হ্যাঁ, বাড়ীতে খাটের ওপর,—এবার মনে পড়েছে, বাড়ীতে খাটের ওপরই; বাড়ীতে খাটের ওপর বাবু নৃসিংহনারায়ণ, আমি এবং আমার সেজছেলে ন্যাপলা—। এই অব্দি বলেই মুক্তহরিবাবু আবার না জানি কেন ঘোঁক ক'রে আওয়াজ করেন। উঁহু, তিনি বলেন না, সেজছেলে কেন, আমার বড় ছেলেরই ত' তখন জন্ম হয়নি;

শুধু তাই কেন, আমার তখন বিয়েই হয় নি—তা হ'লে আমার সেজ-ছেলে আসবে কোথা থেকে ?—এ্যাঁ ?

একটু বাদেই আবার মুক্তহরিবাবুর মনে পড়েছে !

এবারে স্পষ্ট মনে পড়ে তাঁর। দেখতে পান তিনি চোখের সামনে যেন স্পষ্ট ! *In the year 1946—Hindoo-Muslim Riot,*—হ্যাঁ সে-বছরই,—উঁহু (আবার সেই ঘোঁক করে আওয়াজ), *—In the year 1914,—First World War,*—হ্যাঁ এবারে আর ভুল নেই ; অনেকদিন আগের ঘটনা কিনা, ঠিক-ঠিক মনে নেই, তবে দেখছ কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই মনে ক'রে বলছি !

হ্যাঁ, ফ্যাষ্ট ওয়ালর্ড ওয়ার তখন ! —আমি, নৃসিংহ এবং না,—ন্যাপলা তখন হয়নি,—আমরা দু'জন বেরিয়েছি এক্সিবিসন দেখতে ; সময়টা বৈশাখ কিন্তু বর্ষাকাল মনে আছে। দাঁড়াও ভেবে দেখি ! না, বৈশাখ নয়, আষাঢ় মাসের রথের দিন। রথের দিন মনে আছে কেন জান ?—কারণ সেই প্রথম রথের দিন এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয় নি ! হ্যাঁ, রথের দিন আমরা বেরিয়েছি, কোথায় ?—

একজন মনে করিয়ে দেয়,—আজ্ঞে এক্সিবিসনে ; 'উঁহু',—মুক্তহরি বিস্মৃতি মুক্ত হন,—উঁহু' আমরা বেরিয়েছি তেল কিনতে। হ্যাঁ,—না, তেল কিনতে আমরা যাব কেন ? উঁহু ! দাঁড়াও, ঠিক ঠিক মনে করতে দাও— !

বেলা একটা-চল্লিশের সময় তাঁর মনে পড়ে। ন্যাপলা তখন হয়নি ; এবং নৃসিংহনারায়ণ মারা গেছেন। নৃসিংহের শ্রাদ্ধে তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে নৃসিংহর সেই বিখ্যাত হাসির কথাটি তিনি শোনেন। এখন অবশ্য, কথাটা যে কি, তা আর তাঁর মনে নেই, তবে মুক্তহরিবাবু মুক্তকণ্ঠে আশ্বাস দেন যে, যদি তিনি আজ মনে ক'রে সেই হাসির কথাটা বলতে পারতেন, তাহ'লে এখানে আজ যারা উপস্থিত, তারা সবাই প্রচণ্ড হাসি হাসত, যে, এতে কোন সন্দেহ নেই !

শুনে ননী সত্যই ভেউ-ভেউ ক'রে যা ক'রে উঠে তা হাসি কি কান্না, সে নিজেই বুঝে উঠতে পারে না।

ননীগোপাল সেদিন বোধ হয় শেষ পর্যন্ত হেসেই থাকবে; নাহলে 'যত হাসি তত কান্না' এই প্রবাদ বাক্য তার একটু বাদেই ফলতে থাকে কোন্ দুঃখে? মানসী ননীকে জানালো তার জ্যাঠা ননীর ওপর ক্ষেপে গেছেন এবং ননীকে তার আড্ডায় যখন-তখন নিয়ে যেতে বারণ করেছেন। ননী মানসীর জ্যাঠার বারণ শুনে সেখানে যাওয়া বন্ধ করল বটে, কিন্তু মানসীকে তার বদলে নিয়ে গেল নিজের বাড়ীতে; এ-কাজে নিবারণ করা গেল না তাকে কিছুতেই।

ননীর মা এবং বোনেদের সঙ্গে পরিচিত হ'ল মানসী মল্লিক। কিন্তু বর্ণ-পরিচয় পর্যন্ত এগিয়েই ননী থেমে যায়; আলাপের চারুপাঠ পর্যন্ত এগুতে ভয় পায়। কিছুতেই সেই মারাত্মক তিনটি কথা ননী উচ্চারণ করতে পারে না; সেই,—'আমি তোমায় ভালবাসি' যা না বলা পর্যন্ত কিছুই বলা হ'ল না। কারণ এই ক'টি কথাই হচ্ছে জীবনের চেক বইতে প্রেমের রাবার স্ট্যাম্প!

পদ্যে এবং গদ্যে ননীগোপাল যতই এগোয়, আসল জায়গায় গিয়ে ননীর বাক্যস্ফূর্তি হয় না; মানসী চলে গেলে, মানসীকে বলার কথা বলতে না পেরে ননীর বিষণ্ণ মূর্তি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু সবই, শুধু ননী নয় আমরাও বুঝতে পারি। মানসীর সঙ্গে ক্লাস পালিয়ে সে কখনও যায় কফি হাউসে; কখন ওয়াই-এম-সি-এর বাড়ীর নীচের রেস্তোরাঁয়! কখনও বা সরবতের দোকান,—প্যারাডাইসে। সেখানে ফুল্স্ প্যারাডাইস থেকে বারবার পতন হয় ননীর।

'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই'—এ-কথাটা মনে-মনে হাজারবার বলা হয়ে গেছে; কিন্তু তবু, তবুও কোথায় যেন মুখে বলতে মানসীর মুখোমুখী হয়ে, ননীর কোথায় যেন বাধে! ননীর দিক থেকে বারবার তাড়া আসে; মানসীও আসে এগিয়ে। বাইরে বৃষ্টি পড়ে; অন্ধকার হয়ে আসে। মানসীর হাতে হাত রাখে ননীগোপাল।

ঠিক মুড হয় ঠিক কথাটি বলবার; ননী বলেও: (ননীগোপাল দে, ডবল বি-এ। আদর্শ যুবক) তাহ'লে শোন, নেতাজীর গল্প; —আর ছিটকে পড়ে মানসী; রাগে কি অনুরাগে কে জানে!

ননী শেষ পর্যন্ত স্থিরনিশ্চয় হ'ল, লোকজনে, ভীড়ে, রাস্তায়, দোকানে বলা যাবে না-সে কথা; কিছুতেই হবে না বলা!

ঘরনী হবার প্রস্তাব করতে হয় নিজের ঘরে বসেই!

মানসীকে আজকাল ননী রোজ নিয়ে যায় নিজের বাড়ীতে। রোজ ননী ঠিক করে, আজ সে বলবে। 'আজ' রোজ 'কাল' হয়। কাল আবার 'আজ' হ'য়ে এলে 'আজ' আবার 'কাল' হ'য়ে দেখা দেয়! তারপর আজ-কাল করতে-করতে সেই দিনটি সত্যি-সত্যি এলো।

বাবা বেরিয়ে গেছেন; মা আর বোনেরা ওপরে। ননী আর মানসী নীচের তলায় ঘরে ওঠবার রকে বসে গল্প করছে। চাঁদের আলোয় সাদা শাড়ীতে মানসীকে মনে হচ্চে রূপকথার রাজকন্যে! এ-কথা সে-কথার পর সেই কথাটি বলবার জন্যে একটু দমকা-সাহস সঞ্চয় করতে ননী মানসীকে একা রেখে ঘরের ভেতর গেল একবার।

ঠিক সেই সময়ই বাইরে থেকে বেড়িয়ে ননীর বাবা বাড়ী ফিরলেন; মানসী তাঁকে দেখেই পালিয়ে গেল ওপরে ননীর মা-বোনেদের কাছে। ননীর বাবা এসে বসলেন মানসীর পরিত্যক্ত জায়গায়। গায়ে সাদা শাল তাঁর। তিনি বসে-বসে তাঁর বাগানের গাছের কথা কি তাঁর ছেলের গেছো মেয়ে-বন্ধুদের কথা ভাবতে লাগলেন, কে জানে!

ননী সংকল্পে দৃঢ় হ'তে সময় নিলে। কিন্তু একবার সংকল্প নেবার পর আর দৃকপাত করল না; সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল শাদা শাল দেখেই। সঙ্গে-সঙ্গে ননীর বাবার চীৎকার: আমি, আমি, আমি তোমার বাবা!—এবং ওপর থেকে ভেসে এলো মানসীর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর: আমি এখানে—

বিপদ যেমন দ্বিপদ মানুষের জীবনে কখনও একা আসে না; তেমনি সুযোগ কখনও একটা দেখা দেয় না। একটা সুযোগ আরও একাধিক সুযোগকে সঙ্গে নিয়ে আসে। একাধিক সুবর্ণ সুযোগে! ননীর জীবনে বর্ণে-বর্ণে ফলে গেল একথা। মানসীর জন্মদিনে ননী মানসীর বাড়ী যাবার নিমন্ত্রণ পেল। দ্বিতীয়বার যাবার।

ননীকে প্রহ্লাদ উপদেশ দিলো: তুই কি রে? বিয়ে করতে চাওয়ার মত সহজ কথাটা এতদিনে পাড়তে পারচ্ছিস না?

ইয়ে—শোন! মানসীর কাছে এক গ্লাস জল খেতে চাইবি প্রথমে বুঝলি?

—বুঝলাম!

—তারপর জিজ্ঞেস করবি। জলের হিন্দী কি বল ত', মানসী?

—বুঝলাম না।

—মানসী বলবে, কেন জলের হিন্দী হচ্চে পানি!

—তারপর?

—তারপর সোজা মানসীর হাত দুটো ধরে বলবি, মানসী তোমার পানি গ্রহণ করলাম।

উপদেশ দিয়ে প্রহ্লাদ এক মুহূর্ত দাঁড়াল না।

কিন্তু ননী কারুর কথা এবার শুনবে না। এসপার-ওসপার যা করবার সে নিজেই করবে। মানসীর জ্যাঠামশাই সম্বন্ধে সে অনেক খবর জোগাড় করল। তার মধ্যে সব চেয়ে জরুরী হ'ল, মানসীর জ্যাঠামশায়ের ধারণা এযুগের ছেলে মেয়েরা সবাই দুর্বিনীত। দিলীপের মাধ্যই তিনি একমাত্র বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখেছেন। মানসীর বাড়ীতে যাদের যাতায়াত আছে, তার মধ্যে দিলীপকেই একমাত্র তাঁর পছন্দ।

ননী মনে মনে নিজের কর্তব্য ঠিক ক'রে নিলো। মানসীর বাড়ী গিয়ে সবার আগে মানসীর জ্যাঠামশায়ের পায়ে একটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। একেবারে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে; যতক্ষণ না

জ্যাঠামশায় পা না ছাড়িয়ে নিচ্ছেন, ততক্ষণ ছাড়া নয় কিছুতেই ! নাছোড়বান্দা হয়ে পা ধরে থাকা !

সন্ধে উৎরে রাত হয়েছে। মানসীর জন্মদিনের রাত। সবাই এসে গেছে ; ননী আসেনি শুধু। মানসীর জ্যাঠামশাই বাইরের ঘরে বসে গল্প করছেন। ননী এলো গোলাপ ফুলের তোড়া নিয়ে। জ্যাঠামশাই তখনও বলে চলেছেন, আজকালকার ছেলেদের বড়দের সঙ্গে দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে। অসম্বদ্ধ প্রলাপ মনে হ'ল ননীর। কিন্তু আজই জ্যাঠামশায়ের এ-ধারণার উপর শেষ যবনিকা-পতন হবে !

ননী যেমন ভেবে এসেছিল, তেমনি করল কাজ।

সটান শুয়ে পড়ল মাটিতে।

লম্বা হয়ে শুয়ে হাত ঠেকাল জ্যাঠামশায়ের এক পায়ে জ্যাঠামশায় চীৎকার ক'রে উঠলেন ঃ থাক ! থাক ! কিন্তু কার কথা কে শোনে ? এক-পায়ে প্রণাম করতে নেই ঃ ননী জানে। করলে গোদ হয়।

আরেক পা খুঁজতে লাগল সে।

ছাপ্পান্ন ইঞ্চি ধুতি সরিয়ে, আরেক পা কোথায়, তাই তার একমাত্র জিজ্ঞাসা তখন। ধুতি তুলে, তুলতে-তুলতে, হাঁটু পর্যন্ত তুলবার পর তবে ননীর জ্ঞান হ'ল। মানসীর জ্যাঠামশায়ের আরেক পা নেই ; তিনি খোঁড়া।

এ-ঘটনার পর ননী শুনল, মানসী নাকি সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বলে বেড়িয়েছে যে, ননী নাকি ইচ্ছে করেই মানসীর জ্যাঠামশায়কে অপমান করবার জন্যেই প্রণাম করতে গেছিল।

আর ননী শুধু ভেবেছে, মানসী এত কথা বলেছে, অথচ তার জ্যাঠামশায়ের এক পা যে নেই সে কথাটাই শুধু বলে নি ; সেই না থাকা পায়ে হাত দিতে গিয়েই ত' ননী পা দিয়েছে নিজের ভাগ্যের উপর ; শুধু পা দেয়নি থেঁৎলে ফেলেছে একেবারে !

বিদ্যাসাগর মশায়ের কথা মনে হয় ননীর ; ভীষণ রাগ হ'ল তার। বিদ্যাসাগর মশায় কেন যে কাণাকে কাণা, আর খোঁড়াকে খোঁড়া বলতে সবাইকে বারণ ক'রে গেছিলেন তার কোন কারণই খুঁজে পেল না সে।

তিন

প্রেমে পতন ছাড়া আর কিছু নেই,—মানসী মল্লিকের সঙ্গে ওই কাণ্ডের পর ননীগোপালের জীবনের সাম্প্রতিকতম অভিজ্ঞান হ'ল এই। বিশ্ববিদ্যালয়কে বিষবৎ মনে হচ্ছে তার; প্রহ্লাদ দত্ত প্রমুখ বন্ধুদের মনে হচ্ছে হিরণ্যকশিপু সদৃশ বৈরীকুল।

ইউনিভার্সিটি ত্যাগ ক'রে সে একটা কাজ নিলো; ইনসিউরেন্স ব্যবসার একটা কাগজে। ইনসিউরেন্স-সংক্রান্ত তত্ত্ব ও তথ্য এবং তার চেয়ে বেশী বিজ্ঞাপনে পূর্ণ সেই কাগজ। বিজ্ঞাপনের মধ্যেও আবার ইনসিওরেন্স কোম্পানীর চেয়ে বেশী বিজ্ঞাপন অন্যান্য পণ্যের। সম্পাদকই মালিক। তিনি ইনসিওরেন্স এজেণ্ট ছিলেন। তখন না খেতে পাওয়ার হাল ছিলো। এখন কাগজ ক'রে বেশ দু'পয়সা করেছেন। খানিকটা ভয়ে; খানিকটা বিরক্ত হয়ে বীমা সংস্থানেরা বিজ্ঞাপন দিতো। কাগজের খরচা চলে গিয়েও সম্পাদক-মালিকের হাতে জমত বেশ কিছু। ইউনিয়নদের হয়ে লড়বার ভয় দেখিয়ে বীমা-কোম্পানীর মালিকদের কাছ থেকে উপরিও ছিলো। এরই উপরে নিশ্চিন্ত হয়ে, পায়ের উপরে পা দিয়ে তোফা চলছিল সম্পাদক মালিক গোবর্ধন তা'—এর। সেই কাগজে সহ-সম্পাদকের পদে বাহান্ন টাকা বারো আনায় বহাল হ'ল ননীগোপাল দে, ডবল বি, এ,। পঞ্চাশ টাকা মাইনে আর শনি-রবি বাদ দিয়ে বাইশ দিনের টিফিন (হাই টি) দু'আনা ক'রে, দু'টাকা বারো আনা।

সহ-সম্পাদক ননীগোপালের কাছে জীবন তখন দুঃসহ, তাই সে তিন মাস টিঁকলো। তেরো দিনের বেশী, এর আগে গোবর্দ্ধন তা'য়ের কাছে কেউ টেঁকে নি। সহ-সম্পাদকের কাজ বুঝিয়ে দেবার সময় গোবর্ধন বলেছিলেনঃ কাজের মধ্যে, এ-আপিসে শুধু খাই আর শুই, এই দুই কাজ তোমার; দপ্তরী বাড়ী থেকে কাগজ ক'খানা বাঁধিয়ে আনবে; বেশী কাগজ নয়; যে-কজন বিজ্ঞাপন দেয়, তাদের জন্যে ভাউচার কপি ক'খানাই শুধু ছাপা হয়। সেগুলো বাঁধিয়ে এনে ডেস-প্যাচ ক'রে দেবে ঠোঙ্গায় ভরে, গ্রাহকদের নাম ঠিকানা লিখে; পোস্টাপিসে নিজে গিয়েই ফেলে দেবে। তারপর বিজ্ঞাপনের টাকা ক'টা আদায় করা দরকারই, না-হ'লে তোমার নিজের মাইনেই আটকে যেতে পারে। হ্যাঁ, আর একটা খুব সোজা কাজ হচ্ছে আমাদের যে সব বিজ্ঞাপনের ক্যানভ্যাসার আছে ভারতবর্ষের সর্বত্র, তাদের চিঠির জবাব দেওয়া; রোজই তাদের দেড় আড়ায়েক চিঠির জবাবে চোখ বুঁজে লিখে দেবেঃ *Very Good news! Go on! Want more business* ইত্যাদি। চিঠি পড়বার দরকার নেই, কারণ তাদের প্রত্যেকের চিঠির বক্তব্য একই। সে বক্তব্য হচ্ছে যে তারা খুবই ভালো কাজ করছে, আরও সুবিধে পেলে কাজ বাড়াতে পারে। কাজেই তার উত্তরও ওই বাঁধা; শুধু বেশি সুবিধের কথায় কোন কিছু না লিখে চেপে যাবে।

ননীগোপাল দে ডবল বি-এ মন দিয়েই কাজ করছিলো। দু'মাস উনত্রিশ দিন করলও মন দিয়ে। তারপরেই একদিন কেলেঙ্কারী হয়ে গেলো। ননীর অবশ্য তাতে কোনও হাত ছিলো না। বোধ হয় সেদিন কিংবা তার আগের রাত থেকেই ত্রহস্পর্শ লেগে থাকবে; না হ'লে কেন হবে এমন? আর হলেও কী ননীর ভাগ্যেই হতে হবে বারবার? ননীর দুর্ভাগ্যেই।

যেদিন ইস্তফা দিতে বাধ্য হ'ল ননী, অর্থাৎ যা ঘটল এবং যাতে ননীর আর আপিষ যাবার কথা মনেই এলো না, সেই দিনের আগের

দিন বিকেলে ননী আর প্রহ্লাদ রাস্তায় বিতর্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল; সঙ্গে ছিলো দিলীপ চৌধুরী। ইকনমিক্স-এর ছাত্র দু'জনেই; ননী আর প্রহ্লাদ। কাজেই তারা তর্ক করছিল ফিলসফি নিয়ে; এবং দিলীপ যেহেতু কোনটারই ছাত্র নয়, গুণ্ডামীর ভক্ত, সেহেতু সে বিরক্ত হচ্ছিলো; এবং কোনও এক সময়ে একটা পাথরের ডেলা ননীর বার্মিস ঝোলার মধ্যে দিলীপ টুপ ক'রে ফেলে দিলো। ননীর ঝোলায় সেই অতিরিক্ত পাথর ষাঁড়ের পিঠে কুঁজের মতই ভারী হলেও, তর্কের উত্তেজনায় সহজেই বাহিত হ'লো।

এবং *Morning shows the day*—না হ'য়ে *Evening shows the following morning* হ'ল ননীর জীবনে। সেই স্মরণীয় সন্ধ্যা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে আজও। পরের দিন সকালে। ঘুম থেকে দেরীতে ওঠবার কথা, ননীর মেজদার কানের কাছে ষাঁড়ের মত চীৎকার অকালে ভঙ্গ করল ঘুম। 'আমার কলম নিয়েছিস তুই?' —ননীর মেজদার জিজ্ঞাসা। ননীর জবাব: না। 'দেখ খুঁজে তোর ঝুলিতে আছে বোধ হয়!' —ননীর মেজদার আবার আক্রমণ। এবং সঙ্গে-সঙ্গে ননী সেই সমূলে ঝুলি উৎপাটন ক'রে দেখাতে গেছে যে সে যা বলছে তা অমূলক নয়, ব্যস, আগের সন্ধের সেই পাথরের ঢেলা মেজদার মাথায়,—আর? আর ননী সেই অবস্থাতেই রাস্তায়!

সেই অবস্থাতেই দৌড়তে দৌড়তে ননী অফিসে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। চেয়ারে বসতে না বসতেই শুনলো তাকে অফিসের মালিক-সম্পাদক ডাকছেন। মালিকের কাছে যাওয়া মাত্তর তিনি যেন তেড়ে মারতে এলেন; এরকম মারমূর্তি ননী কোনদিন দেখে নি।

'ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ' বিচ্ছিরি এক আওয়াজ ক'রে মালিক বলেন; তোমার ওপর বিশ্বাস ক'রে সব ছেড়ে রেখেছিলাম, তার এই ফল?

ননী ভাবতে থাকে; কী বিশ্বাসঘাতকতার কাজ সে করেছে? ক্যাস ভেঙ্গেছে? উঁহু! আফিসের ক্যাশে ত' বড় জোর টাকা দেড়েক থাকে! ইনকাম ট্যাক্সের কোনও লোকের কাছে কোনও বেফাঁস কিছু বলেছে? উঁহু! ইনকাম ট্যাক্সের লোকেরাই এ-অফিসকে ডরায়; অফিসের মালিকের ত' সে চিন্তাই নেই, খাতার এমন পাকা ব্যবস্থা!

বাঘ যেমন ক'রে লাফিয়ে পড়ে খাদ্যের ওপর; পাব্লিশার যেমন ক'রে না-খেতে-পাওয়া লেখকের ওপর; হেরে যাওয়া নির্বাচন প্রার্থী যেমন ক'রে আঁকড়ে ধরে বাই-ইলেকশনের শেষ তামাসাকে, তেমনি ক'রে ইনসিওরেন্স-কাগজের সম্পাদক ঝাঁপিয়ে পড়লেন ননীগোপালের ওপর, ঘরে ঢোকা মাত্রই।

'ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!' তিনবার মাত্র 'ছিঃ' বলে কারুর সমস্ত চেহারাটাকেই যে বিচ্ছিরি ক'রে দেওয়া যায়, ননীর তা এই প্রথম হৃদয়ঙ্গম হ'ল।

'চিঠির জবাব দাও, চিঠিগুলো পড় না?'—মালিক জিজ্ঞেস করেন।

'আজ্ঞে, আপনিই ত' বলেছেন চিঠিগুলো পড়ে সময় নষ্ট না করে, বাঁধা জবাব ছেড়ে দিতে!'—ননী বোঝাবার চেষ্টা করে!

ফলে তা' বোঝা হয়ে চাপে মালিকের শাকের আঁটির ওপর; 'পড়তে বারণ করেছি বলে চোখ বোলাতেও দোষ আছে কিছু?' মালিকের মোক্ষম জিজ্ঞাসা!

'আজ্ঞে না!' ননীর ত্রুটি জ্ঞাপন।

তবে?

কেন কিছু হয়েছে?

হতে বাকী আছে কিছু আর? [এই মুহূর্তে ননীগোপালের কেন জানি না মনের কোণে গুণগুণ ক'রে রবি ঠাকুরের গানের কলি গুলিয়ে উঠল, 'বাকী আমি রাখব না কিছুই!]

মালিক একখানা চিঠি বার করে দিয়ে পড়তে বলেন, ননী পড়ে; চোখ কপালে তুলে পড়ে; পড়ে চোখ কপালে তোলে।

কী সর্বনাশ! একজন এজেণ্ট জানিয়েছিল তার মা মারা গেছেন বলে সে কাজ করতে পারে নি কিছু। ননী তাকেও বাঁধা গতে চিঠি ছেড়েছে: *Very Good News! Go on! Get more business!*

ননী আর দাঁড়ায় না; দাঁড়ানো যুক্তিযুক্ত মনে করে না বোধ হয়। ঠিকই করে। কামানের মুখে তবু দাঁড়ানো যায়: কিন্তু ইনসিওরেন্স কাগজের মালিকের না কামানো মুখের সামনে দাঁড়ানো অসম্ভব।

ননী নিজের ঘরে ফিরে আসে। একটু বাদে বাথরুমে যাবার প্রয়োজন পড়ে। অফিসে দুটো বাথরুম; একটা অন্যান্যদের জন্যে; আরেকটি মালিক আর ননীগোপালের জন্যে সংরক্ষিত। সংরক্ষিত বাথরুমের দুটো চাবির একটা থাকত মালিকের, আর আর অন্যটা ননীর কাছে। ননী বাথরুম থেকে ফিরে নিজের রুমে একটুখানি বসতে না বসতেই মনে হ'ল বাথরুমে চাবি দিয়ে বন্ধ ক'রে আসতে ভুলে গেছে দরজা। আবার দৌড়ল। নিজের হাতে চাব দিয়ে বন্ধ ক'রে বাথরুম, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে এসে টেবলে বসল ননীগোপাল।

এবং বসেই রইল চুপ ক'রে; চুপচাপ বসে রইল বেলা চারটে পর্যন্ত। মালিক পর্যন্ত সেদিন আর একবারও ডাকলে না ননীকে। কিন্তু চারটের পর আর বসা চলল না। বসতে দিল না তাকে। অফিসের কেউ নয়; অফিসের পেছন দিকের বাড়ীর লোকেরা এসে তাকে উঠিয়ে দিল। কী ব্যাপার? ননীর অফিসের বাথরুম থেকে কে যেন চীৎকার ক'রে হাত-পা নেড়ে বোঝাতে চাইছে কী!

'বাথরুমে কে আবার? ননী ভাবতে-ভাবতে এগুয়; এগুতে এগুতে ভাবতে থাকে। ননীগোপাল বুঝতেই পারে না এর মধ্যে বাথরুমের ভেতর কে যেতে পারে? আর যদি যেতেই পারে ত' বেরুতে পারে না কেন? বুঝতে একদম পারে না বললে অন্যায় হবে, একটু বাদেই

বুঝতে পারে ; বুঝতে পারে সব। কিন্তু সে-বোঝা না বুঝতে পারলেই যেন ছিলো ভালো। ননীগোপাল যখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে দরজা খোলা রেখে নিজের চেয়ারে এসে বসেছিলো, তখনই, ঠিক তখনই কাগজের মালিক-সম্পাদক বাথরুমের ভেতরে গিয়ে ঢোকেন। ঢোকবার মুখেই বাথরুমের দরজায় যে ননী চাবি দিতে ভুলে গেছে তা লক্ষ্য করেন ; কিন্তু কিছু ব'লেন না। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ননীর ওপর আরেকবার ঝাল ঝাড়তে পারবেন ভেবে পুলকিত হ'ন। কিন্তু বেরুনো তাঁর আর হয় না !

ইতোমধ্যে ননীর মনে পড়ে বাথরুমের দরজায় তালাতে চাবি দিতে ভুলে গেছে সে। ননী সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে বাথরুমের দরজায় চাবি দিয়ে দেখে আসে ভালো ক'রে দরজায় তালা পড়েছে কী না। ভালো ক'রেই তালা বন্ধ হয় চার তালার সেই অফিস থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরের বাথরুমে যার ভেতরে ননীর মালিকের মনে তখনও অকারণ পুলকের সঞ্চার ননীকে আরেকবার খোলসা ক'রে গালাগাল দিয়ে নিজেকে ভারমুক্ত করতে পারার সম্ভাবনায়।

ননীর অফিসের পেছন দিকের কোনও বাড়ী থেকে যখন কারা এসে জানায় যে ননীদের অফিসের বাথরুমে কে হাত-পা ছুঁড়ছে আর চীৎকার করে কি সব যেন জানাতে চাচ্ছে, তখনও ননীর মনে কোথাও মালিকের কথা ঘুণাক্ষরেও উদয় হয় নি। ননী তাই বাথরুমের দরজায় কান পাতে। যা শোনে তাতে কান পাতা যায় না। ননীর মালিক চীৎকার ক'রে চলেছেন : ইষ্টুপিড্ ! রাস্কেল ! উল্লুক ! বাঁদর ! গাধা ! আরও যা বল্‌েন তাতে ননী নয় ননীর বাবাও শুনলে মনক্ষুণ্ণ হতেন।

ননী আর দাঁড়ায় না। দরজার তালা না খুলেই এক তালায় দৌড়ে নেমে আসে। সেখান থেকে রাস্তায়। এবং সেখান থেকে চলন্ত বাসে। সীটে বসে ভাবতে থাকে আজ সকালে কার মুখ

দেখে সে উঠেছিলো। একটু বাদে তার মনে পড়ে। ধোপা নয়; জমাদার নয়; সামনের বাড়ীর সেই বিদিকিচ্ছিরি বুড়োর মুখও নয়; না। হ্যাঁ, মনে পড়ে ঘুম থেকে উঠেই আয়নায় চোখ পড়েছিলো; সেখানে আর কার মুখ দেখা যায়?—নিজের ছাড়া আর কার? তাই এখন ননীর, এই মুহূর্তে একমাত্র রিসার্চের বিষয়বস্তু হয়।

বাস থেকে নামবার সময় বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে ঘণ্টা বাজাবার জন্য ননী দড়ি ধরে টানে কিন্তু ঘণ্টা বাজে না। তার বদলে বাজের মত ননীর ওপর লাফিয়ে পড়তে চায় বাস-যাত্রীরা। এবং একটি মেয়ের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে: কী করছেন? কী করছেন?

তখন ননীর খেয়াল হয়, সে কী করছিলো; দড়ির বদলে একটি মেয়ের বেণী দরজার গরাদের ফাঁক দিয়ে বাইরে এসে পড়েছিলো, যা ধরে ননী এমন প্রাণপণ টান দিচ্ছিলো। সর্পে রুজ্জু ভ্রমের চেয়ে বাসের মধ্যে মেয়ের বেণীতে দড়ি বিভ্রম যে অনেক মর্মান্তিক, ননীর চর্মভেদ করবার জন্য অনেকগুলি উদ্যত হস্তে ননী যেন তারই স্বাক্ষর দেখে সাঙ্ঘাতিক মর্মাহত হয়।

কিন্তু মেয়েটিই বাঁচায়। মুখ ফেরানো মাত্র মেয়েটি ননীকে দেখে এবং গদগদ হয়ে ওঠে: ননী? ননী চীৎকার করে ওঠে: জুলেখা? বাসসুদ্ধ লোক ননী এবং জুলেখা দু'জনেরই মুখে সেক্সপীয়রের রোমিও জুলিয়েৎ লেখা স্পষ্ট পড়তে পায়; বিরক্ত হয় তারা।

বাস থেকে নেমে পড়ে ননী এবং জুলেখা দু'জনেই।

ননী ভাবে: পথে নারী বিবর্জিতা, কিন্তু বাসে নয়; বাসে সর্বদাই মেয়ের পাশে বসে যেতে পারলেই ভালো। এ-পাশে ও-পাশে দু'পাশে দু'জন হলে আরও ভালো হয়। এবং শুধু পাশে বসে গেলেই হবে না; বাসে আর যারা আছে তারা যেন বুঝতে পারে সেই মেয়ে তোমাকে ভালবাসে।

ননীর সঙ্গে জুলেখা যখন চৌরঙ্গীতে নামল তখন শীতের সন্ধ্যে চৌরঙ্গীর চতুর্দিকে নিওন সাইনে এই নীল, এই লাল এই বুঝি ফের

হলদে-সবুজ। (শম্ভু মিত্রের) বহুরূপী'র মত। ম্যাটিনী শো ভেঙ্গে শ'-শ' লোক; স্ত্রীলোক; সঙ্গে রেজকী বাচ্চা কাচ্চা। কেউ জুয়েটে বেরিয়েছে; কেউ বিজোড়ে। এয়ারকণ্ডিশাণ্ড রেস্তরাঁয় কেউ এক কাপ কফি নিয়ে বসে আছে আড়াই ঘণ্টা; যার আসবার কথা সে আসে নি। অন্যদিকে ময়দানের অন্ধকারে ভূতের মত গাছ দাঁড়িয়ে এক পায়। ফুটপাথের ছেঁড়া চটে শুয়ে স্বপ্ন দেখছে না, একজন ভিখারী সত্যি-সত্যি লাখ খানেক পয়সা গুণছে বসেছে।

ননী জুলেখাকে নিয়ে যে রেস্তোরাঁয় ঢুকলো সেখানে চপ-কাটলেট কারী সব পাওয়া যায়; কিন্তু অর্ডার দেবার সময় সবাই অর্ডার দেয়: এক প্লেট ফুচকা আর চার গ্লাস জল।

জুলেখা এবং ননীগোপাল দু'জনেই বার্মায় পড়তো একসঙ্গে। বোমা পড়বার পর কেউ কারুর খোঁজ জানতো না। এতদিন বাদে আজ দু'জনের হটাৎ দেখা। গভীর সুখে সুখী ওরা দু'জনে মুখোমুখী হয়ে বসল রেস্তোরাঁয় একটি টেবলের দু'দিকে।

ননী চেঁচাতে লাগলো: 'বালক, বালক' বলে।

বালক কে? জুলেখার অবাক জিজ্ঞাসা।

'বালক' হচ্ছে '*Boy*'।

বালক এলো। ননী চিংড়ীর কাটলেট অর্ডার দিলো দু'প্লেট।

পনেরো মিনিটের মধ্যে বয় এসে খবর দিলো: চিংড়ী ফুরিয়ে গেছে। ভেজিটেবল চপ আনবে কি না? ননী আবার মেনু দেখে বললো, না; কবিরাজী কাটলেট নিয়ে এসো দু'প্লেট।

এবারে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বয় এসে বললো: কবিরাজী একটা হচ্ছে মোটে; ভোজিটেবল চপ আনবে কি না? জুলেখা এবারে মেনু দেখে জবাব দিলো: না; 'ডেভিল' আছে তোমাদের এখানে? একগাল শিশুসুলভ হাসি হেসে বয় বললো: হাঁ; নিয়ে আসছি এখুনি।

একটু বাদেই এসে বললো : ডেভিল বেরিয়ে গেছে !

জুলেখা জলের গেলাস মুখে তুলেছিলো বিষম খেলো। ডেভিল আবার বেরুবে কি ?—অনেক্ষণ বাদে ননী শুধু এটুকুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করতে পারে।

বয়ের কথাতে অবশ্য একটু বাদে বোঝা গেলো। জলের মতই বোঝা গেলে। ডেভিল হচ্ছে উচ্চারণ না করতে পারার জন্যে ডেভিড় বলে একটি বয়ের নাম। ননীদের যে বয় বারবার অর্ডার নিচ্ছিলো এবং কোনবারই দিতে পারছিলো না, সে ভেবেছিলো বাবুরা বুঝি তার ওপর রেগে তেনাদের চেনা বয় 'ডেভিড' তথা ডেভিলকে খুঁজছেন। কারণ একটু বাদেই সে তার রাগ চেপে জুলেখাকে বুঝিয়ে দিলো তিনি যা খুঁজছেন তা ডেভিলও এনে দিতে পারতো না ; পারবে কোথা থেকে ? তৈরী নেই যে সেসব খাবার !

ননী এবারে দাঁতে দাঁত চেপে বললো : কিচ্ছু চাই না ; ওমলেট আনো দু'প্লেট ; ব্যস !

এবারে 'বয়' আর দাঁড়ালো না ; ব্যাড বয়েদের মত দৌড়ল ; বোধ হয় আনতেই দৌড়লো। কিন্তু না ; একটু বাদেই গুড বয়ের মত ফিরে এলো সঙ্গে বাবুর্চিকে নিয়ে। কী ব্যাপার ?

বাবুর্চি জিজ্ঞেস করে ; ওমলেট কি চীজ বাবু ?—মামলেট হয় ; ওমলেট হয় না তো কখখনো।

ননী বললো : হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! তুমি মামলেটই নিয়ে এসো দু'প্লেট ; মুরগীর ডিমের।

মুরগীর ডিমের তো হোবে না।

হাঁসের ?

না, বাবু !

তবে মামলেট হবে কিসের ?

ডিমের হোবে না !

তবে ?

ভেজিটেবল মামলেট হয় বাবু! ফাস্ট কেলাস!

ননীগোপাল দে ডবল বি-এ জীবনে এই প্রথম ভেজিটেবল মামলেটের কথা শুনে টেবল ছেড়ে উঠে যাবে কিনা ভাবছে, এমন সময় জুলেখা বলে বসেছে; ভেজিটেবল চপ না কি যেন আগে জিজ্ঞেস করছিলে, তাই নিয়ে এসো।

ননী খেতো না; কিন্তু না খেয়ে টেবল ছেড়ে ওঠা শক্ত, এত ক্ষিদে পেয়েছে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে সে বয়ের পাত্তা নেই আর। ইতিমধ্যে আরও দু'জন অর্ডারের কথা জিজ্ঞেস করেছে; ননী মারমুখো হয়ে বলেছে, আধঘণ্টা ধরে অর্ডার দিয়ে বসে আছি, দু'প্লেট ভেজিটেবল চপ; এখনও দেখা নেই। তারা চলে গেছে।

প্রায় পঁচিশ মিনিট বাদে ফিরে এসেছে সেই বয়। ভেজিটেবল চপ নিয়ে এবারে। কিন্তু সেই বয় একা নয়; আরো দু'জন যাদের ননী ধমকে ছিলো একটু আগে, তারাও প্রত্যেকে দু'প্লেট করে নিয়ে এসেছে ভেজিটেবল চপ। কাউকে ফেরালো না ননী। দু'প্লেটই নিলো। এতো ক্ষিদে বোধ হয় কোনও উদ্বাস্তুরও কখনও পায় না। ঘাসের চপ হলেও ক্ষতি ছিলো না। ঘাস হলেও না। খগানন্দর মত কাঁচ খেতে পারলে এখন চপের সঙ্গে প্লেটগুলোও গলাধঃকরণ করতে পারলে ননীর আনন্দ হ'ত।

খেতে আরম্ভ করতে যাচ্ছিলো এমন সময় পাশের টেবলে গোলমাল শুনে কান পাতলো। কী শুনলো ননীই জানে। খাওয়া বন্ধ রেখে উঠে গিয়ে দাঁড়োলো সেই টেবলের কাছে। ভদ্রলোক হাত-পা নাড়ছেন এবং ভীষণ চেঁচাচ্ছেন! ননী দেখালো তাঁর প্লেটেও আধখানা অভুক্ত সেই ভেজিটেবল চপ।

পরশু খেয়ে গেছি চমৎকার চপ! আজ এরকম হয়েছে কেন? খাওয়া যায় না; গন্ধ!

ননী দেখলো ম্যানেজার তাঁকে অনেক করে বোঝাচ্ছে: আজ্ঞে, এতো পরশুর সেই চপ-ই আজ দেওয়া হয়েছে, খারাপ হবে কেন?

এবং আরেকজন বয় সঙ্গে সঙ্গে আরও খোলসা করে বলে : আজ্ঞে হ্যাঁ, এতো সেই পরশুর চপ যা বেঁচেছিলো তার থেকেই দেওয়া হয়েছে।—কালও দিয়ে ফুরোয় নি ; কখানা ছিল কিনা।

শুনে ননী আর দাঁড়ায় না ; জুলেখাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায় মানুষে ঠেলা গাড়ীতে সরকারের সতর্কীকরণ বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে।

'কলেরার হাত থেকে বাঁচতে টিকা লউন'।

সেদিন জুলেখাই যে তার কপালে লেখা, ননী তা হৃদয়ঙ্গম করলো। মানসী নয়? দরকার নেই মানসী মল্লিকের। তার চেয়ে জুলেখাই ভালো। হোক মুসলমান মেয়ে আর ননী হিন্দু ; তবু এই পথেই হবে হিন্দু-মুসলীম মিলন। জুলেখার *zoo*তেই নিজেকে চিরকালের মত জুতে দেবে ননী। খুসী হয়ে ফিরছিলো বাড়ীতে।

কিন্তু বাড়ীর সামনে পোঁছে, যাকে দেখলো তাকে দেখে ননীর মাথায় বজ্রাঘাত হলো। বজ্রাঘাত হলেও বোধ হয় এর চেয়ে ভালো ছিলো। দুয়ার হতে অদূরে দাঁড়িয়ে খৈনীগোপাল ; ননীর যমজ ভাই।

ননীর বংশপরিচয়ের যে তালিকা আগে দেওয়া হয়েছিলো তাতে খৈনীগোপালের কোন উল্লেখ নেই। নেই, কারণ ননীর জীবনে খৈনী উল্লেখযোগ্য নয়। বরং খৈনীকে সে ভুলে থাকতেই চেয়েছিলো। খৈনী তার জীবনে বিভীষিকা ; তার দিনের নাইটমেয়ার। রাতের ডে-লাইট রবারী।

খৈনীগোপাল এবং ননীগোপাল, দুই যমজ ভাই। বিহারে মামার বাড়ীতে দু'জনে ভূমিষ্ঠ হওয়ায়, একজনের নাম খৈনী (বিহারের) আরেক-জনের নাম ননী (বাঙলার)। দু'জনের চেহারায় কোন তফাত নেই। এক চেহারা। পা থেকে চুল পর্যন্ত এক। এক চুলেরও তফাত নেই।

বড় হবার পর দু'জনের মধ্যে যাতে গুলিয়ে না যায় তারই জন্যে একজন বরাবরই থাকতো বিহারে মামার বাড়ীতে। ননীরা চলে গিয়েছিলো বার্মায় ; তারপর ফিরে এল কলকাতায়। যদি কখনও

একসঙ্গে থাকতো ননী আর খৈনী, তাহলে খৈনী দাড়ি রাখতো ; যাতে অন্তত দাড়ী ধরে বোঝা যেত যে ননী আর খৈনী আলাদা আলাদা জীব। দাড়ি না রাখলে জিব বেরিয়ে যেত ধরতে।

ননী সময় নিলো এতদিন বাদে খৈনীকে দেখে সামলে নিতে। খৈনীর দাড়ি নেই ; সর্বনাশ! ননী একটু বাদে জিজ্ঞেস করেছেঃ কী রে তুই হটাৎ ?

খৈনী ঃ বিয়ে করতে এসেছি।

ননী ঃ সে কিরে ? কাকে ?

খৈনী ঃ একজন মেয়েকে !

ননী ঃ আহা, তা' বুঝেছি, কোন মেয়েকে ?

খৈনী ঃ পরে বলবো সব! বাড়ীতেও জানাইনি ; খবরকাগজ দেখে *apply* করেছিলাম। ছবি চেয়েছে জবাবে ; আমি নিজেই সশরীরে দেখা দেবার জন্যে চলে এসেছি ; ছবি পাঠাইনি!

সত্যিই তাই। খৈনীগোপাল বাড়ীর কাউকে না জানিয়ে বিয়ে করতেই এসেছে। বাড়ীর ওপর সে বিতরাগ। বিতরাগ যমজ ভাই ননীর জন্যেই। ননী চিরকাল মা'-র বাড়ীতে থাকবে আর খৈনী মামার বাড়ীতে। চেহারা যে তাদের দু'জনের এক। তার জন্যে ননীকেও তো সরিয়ে রাখা যেতো। তা' নয় ; খৈনীই চিরকাল বাইরে। একেক সময়ে তার এমন সন্দেহও ঘোরতর হয় যে, কোনও দুর্ঘটনায় যদি ননীগোপাল মারা যায় তো এই এক চেহারার সুযোগ নিয়ে তার বাড়ীর লোকেরা তাকে জলজ্যান্ত দেখে নিশ্চয়ই বলবে যে খৈনীগোপাল মারা গেছে ; এখন রয়েছে শুধু ননীগোপাল।

ননী তাকে জিজ্ঞেস করলো একসময়েঃ দাড়ি কামিয়েছিস কেন ?

খৈনী বললোঃ বড্ডো কুটকুট করে!

ননী ঃ কুটকুট করে বললে কী হবে ? এখন ?

খৈনীঃ একটা নকল দাড়ি তৈরী করিয়েছি ; সেইটে বাড়ীতে এলে খুলে রাখি ; বাইরে বেরুলে পরে বেরুই।

ননী : না সে বিহারে গিয়ে কোর ; এখানে বাড়ীর মধ্যেও পরে থাকবে ; নাহলে রাতে আমার খাবার ঘন দুধের বাটি তোমাকে দিয়ে দেবে।

খৈনী : কেন, আমাকে ঘন দুধ দেবে না কেন ? আমি কি ত্যজ্য পুত্তুর নাকি !

ননী : আহা ! সেটা ভুলে আমাকে দেবে যে—

খৈনী বোঝে অতঃপর যে এতে সত্যিই ভীষণ ক্ষতি হবে। অনতিবিলম্বেই সে শ্মশ্রু ধারণ এবং অশ্রুবর্ষণ করতে থাকে।

খৈনীগোপাল সত্যিই মিছে বলে নি ; সে কাগজ দেখে একটি বিজ্ঞাপনে নিজেকে পাত্র বলে ঘোষণা করে। পাত্রীপক্ষ কলকাতা থেকে খৈনীর ফটো চেয়ে পাঠান। খৈনী ফটো না পাঠিয়ে স্বয়ং হাজিরা দেবে মনস্থ ক'রে কলকাতায় এসেছে। কিন্তু ননীর পরিস্থিতি মারাত্মক। দু'জনের চেহারার সাদৃশ্য নিয়ে অতীতে প্রচুর গণ্ডোগোল হয়ে গেছে। কিন্তু এখন ননীর জন্যে খৈনীর এবং খৈনীর জন্যে ননীর এমন কোনও কেলেঙ্কারী নেই যা না হতে পারে। তাই ননী খৈনীকে পত্রপাঠ বিদায় করতে পারলেই বাঁচে ; অন্যপক্ষে খৈনী সেঁটে থাকতে চায় যতক্ষণ পারা যায় এই কলকাতায়।

কলকাতায় পৌঁছেই খৈনী পাত্রীপক্ষর সঙ্গে টেলিফোনে নিজে দর্শন দেওয়ার দিন পাকা করে : মঙ্গলবার ভর সন্ধেয় ! বিবাহ মঙ্গল কাব্যের প্রস্তাবনা করবার উপযুক্ততম দিন !

মানসী মল্লিকের জ্যাঠার আড্ডা তেমনি জমজমাট। মানসীর পাত্রও তিনি প্রায় ঠিক করে ফেলেছেন। মানসীর মাকে আশ্বাস দিয়েছেন সামনের অঘ্রাণের কোনো শুভদিনেই তিনি মানসীকে শ্বশুর বাড়ীতে পাঠাবেন। মানসী অবশ্য কার কথা মনে করে কে জানে,

বিবাহে নারাজ; শ্বশুর বাড়ীকে অস্থর গৃহ জ্ঞানে সে বিয়ে না ক'রে চাকরী করতে চায়। জ্যাঠা তাকে অনেক করে এই বলে আপাততঃ রাজী করিয়েছেন যে, এই পাত্রের সঙ্গে যদি কোনও কারণে মানসীর বিয়ে কেঁচে যায় তাহলে অতঃপর তিনি মানসীকে বিয়ে করবার জন্যে আর পীড়াপীড়ি করবেন না; পাণিপীড়নের জন্যে আনবেন না আর কাউকে; এবং বিয়ের এপ্লিকেশন না করে চাকরীর এপ্লিকেশন করতে বলবেন মানসীকে তিনি নিজেই।

নিজের আসনে বৈঠকখানায় সবেমাত্র মানসীর জ্যাঠামশাই উপবেশন করেছিলেন। নবরত্ন সভার একেকজন আস্তে আস্তে এসে জমায়েৎ হচ্ছিলেন। মানসীর জ্যাঠার হাতে-পায়ে-মুখে সর্বত্র ব্যাণ্ডেজ। নবরত্ন সভার সকলের আকুল জিজ্ঞাসা: কী ব্যাপার? হাতে-পায়ে ব্যাণ্ডেজ কেন? দুর্ঘটনা নাকি?

আর ব্যাণ্ডেজ কেন? মানসীর জ্যাঠা চমৎকার মল্লিকের মুখে কোনও জবাব নেই। কোন্ মুখেই বা এর জবাব দেবেন তিনি! তাঁর নিজের ছেলেই তাঁর মুখ পুড়িয়েছে। কোনও কেলেঙ্কারী করে বংশের মুখ নয়; কোনও কেলেঙ্কারী না করেই সত্যি-সত্যি তার বাপের হাত-পা-মুখ পুড়িয়েছে!

গতকাল রেডিও শুনছিলেন চমৎকার মল্লিক। বেকায়দা নয়; রেডিও শুনে রান্না শিখছিলেন। হাঁড়ি কড়া উনুন; গরম মশলা তেল-ঘি হাতের কাছেই ছিলো সব। রেডিওর নির্দেশ মতো তোফা এগুচ্ছিলেন। আস্তে আস্তে মন্থরগতিতে কিন্তু নিশ্চিত রাস্তায়। রেডিও বলছিলো: এবার গরম তেলের মধ্যে মাছ কটাকে ছাড়ুন; হ্যাঁ-হ্যাঁ; ছাড়ুন, ছাড়ুন; দেখবেন গরম তেল ছিটকে এসে গায়ে না লাগে! ছাড়ছিলেন চমৎকার মল্লিক, চমৎকার মাছ ছাড়ছিলেন; জলে নয়; তেলে।

এমন সময় রেডিও হটাৎ কেন জানা গেল না নির্দেশ পালটালো। বললো: সামনের দিকে পা চালান; চমৎকার মল্লিক চমৎকৃত হলেন; কিন্তু পা চালালেন সামনের দিকেই; সোজা কড়ায়ের মধ্যে! ফলে

হাত-পা-মুখ ফোস্কায়-ফোস্কায় লুচির মতই ফুলে উঠলো ; ফুলকো লুচির মতোই।

পরে অবশ্য ব্যাপারটা জানা গেল। চমৎকার মল্লিকের ব্যাটা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার পর তবে তার গর্ভধারিণী ব্যাপারটা পরিষ্কার করলেন। বাপ যখন রান্না শিখেছিলেন পাশের ঘরে ছাড়া রেডিও শুনে, ব্যাটা তখন ঘরে ঢুকে মিটার ঘুরিয়েছিলো ; সে মিটারে তখন ব্যায়াম শিক্ষা চলছে ; এবং সেই ব্যায়াম শিক্ষকের গলাই রান্নার মাঝখানে কর্ণগোচর হয়েছে চমৎকার মল্লিকের। এবং সেই নব নির্দেশের ফলেই পা বাড়ানো এবং চমৎকার এই কাণ্ড!

নবরত্ন সভা সেদিন জমলো না।

চমৎকার মল্লিক ব্যস্তও ছিলেন। মানসীকে দেখবার আগে পাত্র স্বয়ং আসছে আজ সন্ধ্যায় দেখা দেবার জন্যে। চিঠির তলায় পাত্রের সই-এর ওপর মানসীর জ্যাঠামশাই আরেকবার চোখে বোলান। *K. G. Dey* ; পুরো নামটা লেখে নি কেন ভাবতে থাকেন তিনি।

খৈনীগোপাল মেয়ে দেখতে বেরুবার সময় বাড়ী থেকে দাড়ী লাগিয়ে বেরুলো বটে, কিন্তু রাস্তা নম্বর ঠিকানা মিলিয়ে মেয়ের বাড়ীতে ঢুকবার মুখে দাড়ী খুলে পকেটে রেখে দিলো। দাড়ী নিয়ে এরকম একটা ব্যাপারে দেখা দেওয়া তার কাছে কেমন যেন *Shavian* লাগলো।

লেকের পাড়ে বসে ননীগোপাল দেখলো ফার্পোর পাঁউরুটির মত চাঁদ উঠেছে আকাশে। সেদিন পূর্ণিমা। কিন্তু ননীর জীবনে অমাবস্যা। জুলেখার সঙ্গে প্রায় একমাস দেখা নেই। জুলেখার বদলে ননীরই রমজান চলছে। গত ষোলই আগস্ট রায়ট বেধেছে। হিন্দু-মুসলমানের মল্লযুদ্ধে উলুখাগড়ারাই মারা গেছে। কিন্তু জুলেখার সঙ্গে ননীর হয়ে গেছে ফারাক।

ননীর বাড়ীর লোকেরা, পাড়ার মাতব্বররা সবাই মিলে ননীকে ভালো করে সমঝে দিয়েছেন, খবরদার! মুসলমান মেয়ের সঙ্গে আর কোনও দিন হিন্দুর ছেলেকে দেখলে তারা মুসলমানকে ছেড়ে দিতে পারেন কিন্তু হিন্দুকে নয়। 'যবন-প্রণয়', জীবন থাকতে নয়—এই হয়েছে তাদের স্লোগান।

অন্যপক্ষে জুলেখাকেও তার পরিবারের লোকেরা কাফের-সঙ্গ করতে নিষেধ করেই ক্ষান্ত হন নি শুধু; কোনদিন যদি ননীকে আর ছায়া মাড়াতে দেখেন জুলেখার, তাহলে তারা বলেই রেখেছেন ননীকে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে তবে সেকাজে এগুতে হবে; এ কথা জুলেখা জানিয়ে দেয় ননীকে।

মাঝে একদিন ননী খৈনীর দাড়িটা ধার চেয়ে পায়জামা পরে বেরিয়েছিলো জুলেখার পাড়ার উদ্দেশ্যে। রাস্তায় ধুতি-পাঞ্জাবীকে জিজ্ঞেস করেছিলো আর এগুবে কি না; মুসলমানদের হাবভাব কি রকম? যে-ছেলেটিকে প্রশ্ন করেছিলো ননী সে যেন কি রকম ভড়কালো ননীর কথা শুনে! 'ই-আল্লা' বলেই সে এক দৌড়ে পগার পার! ননীর তখন হাঁটু কাঁপতে আরম্ভ করেছে; ধুতি-পাঞ্জাবী ভেবে যাকে সে হিন্দু মনে করেছিলো আসলে সে মুসলমান; ননীর দাড়ী পায়জামা দেখে সে ননীকে হিন্দু বলে ভাবতে পারে নি।

তারপরও আরও বহুদিন কেটে গেছে; কিন্তু রায়ট থামবার কোন লক্ষণ নেই। অথচ জুলেখার সঙ্গে আর না দেখা হলে প্রাণ বাঁচে না। অবশেষে ননী মনস্থির করে জুলেখাকে জানিয়েছে যে কপালে যাই লেখা থাক জুলেখার সঙ্গে সে অতঃপর দেখা করবেই! জুলেখা তার উত্তরে জানালো: খবরদার যেন ননী একাজ না করে; সে-ই আসবে ননীর কাছে সময় হলে। কিন্তু না, ননী লেকের পাড়ে বসে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিল যে, জুলেখার তার কাছে আসা একটা অবিমৃষ্য-কারিতা হবে: তার চেয়ে সেই যাবে জুলেখার কাছে! আগামীকালই যাবে! ভয় পাওয়া কিছু কাজের কথা নয়; সেক্সপীয়রের বাণী তার

মনে গুঞ্জন করে উঠল: *Only (Noel) Cowards die many times before their death !*—ননী *Coward* হতে পারে কিন্তু *Noel Coward* সে হবে না কিছুতেই।

বাড়ীর দোতলার জানলায় দাঁড়িয়েছিলো জুলেখা। দূর থেকে ননীকে রাস্তা দিয়ে আসতে দেখেই জুলেখা বসে পড়লো মাথায় হাত দিয়ে; চুল ছিঁড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করলো তার। পই-পই করে সে চিঠি লিখে জানিয়েছিলো ননীকে না আসবার জন্যে। এখন? ভাইদের চেনে জুলেখা; এখনি একটা খুন-খারাপী যা হোক কিছু হবে। আর তারপর?

কিন্তু একি! জুলেখা কি স্বপ্ন দেখছে? নীচের ঘরে ননী এবং তার ভাইদের সম্মিলিত সোল্লাস চীৎকার উঠে এলে দোতলায়। ননী হাসছে; তার ভায়েরাও। সবাই গদগদ। তারা একসঙ্গে উঠে এলে দোতলায়।

ননী এলো ভেতরে; এ সেই চীৎকার করে জানালো: আর ভয় নেই জুলেখা। আমি মুসলমান হয়েছি।

তবু, তবুও জুলেখা হাউ-হাউ করে কাঁদে কেন? কিছুতেই বুঝতে পারে না ননী। অনেকক্ষণ বাদে ননী বুঝলো। কাঁদতে-কাঁদতে জুলেখা জিজ্ঞেস করলো ননীকে: কেন তুমি এ-কাজ করতে গেলে?

ননী তো বুড়বাক; বলে কি জুলেখা?—ননী মুসলমান হলে তো জুলেখার খুসী হবারই তো কথা!

তবে?

জুলেখা সব সন্দেহের নিরসন করে বলে: আমি যে এদিকে হিন্দু হয়ে এসেছি।

বাড়ী ফিরবার পথে যখন ননী ভেবে সান্ত্বনা পাচ্ছিলো যে ভাগ্যিস মুসলমান হয় নি সে; শুধু ধাপ্পা দিচ্ছিলো; তখন বাড়ীতে বসে

জুলেখা আর তার ভায়েরা হেসেই সারা এই ভেবে যে যাক তবু একজন হিন্দুকে মুসলমান করা গেছে। কিন্তু হিন্দুরা কি বোকা? সত্যি সত্যি ভাবলো যে একজন হিন্দুকে বিয়ে করবার জন্যে একজন মুসলমান মেয়ে সত্যি হিন্দু হ'তে পারে। আশ্চর্য। পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে তারা যে-যার কাজে চলে গেলো একটু বাদেই; শুধু জুলেখা তার নিজের ঘরে বসে বসে বাস্তবিকই বিষণ্ণ হয়ে ভাবলো যে যদি সত্যিই সে হিন্দু হতো। বোকা ননীগোপালকে তার ভালো লেগে গিয়েছিলো সত্যিই।

বাড়ী ফিরে কিন্তু ননী আরেক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলো। খৈনী-গোপালের মাথা ব্যাণ্ডেজ করা। মুখ-চোখ-নাক ফোলা। কী ব্যাপার? আর ব্যাপার! খৈনী সব কথা খুলে বললো; বলতে বাধ্য হলো। কার মেয়েকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করেই এই হাল। খৈনীকে বাড়ী ডেকে নিয়ে গিয়ে উত্তম-মধ্যম ধোলাই দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

ননী জানতে চাইলো কার বাড়ীতে বিয়ের প্রস্তাব করতে গিয়েছিলো খৈনী। খৈনী বাড়ীর ঠিকানা নয় শুধু, তার সঙ্গে মেয়ের ছবিও বার করলো। ননীর মুখ দিয়ে শুধু বেরুলো:

এ্যাঁ? মানসী— ?

মানসী মল্লিক, এম-এ দিয়েছে গতবার; জ্যাঠার নাম চমৎকার মল্লিক,—বলেই চলেছিলো খৈনী; ননীর দিকে চোখ পড়তে থেমে গেলো; তারপর চীৎকার করে উঠলো সে: ও: বুঝেছি তুমি কোনও কেলেঙ্কারী করে এসেছ এ-বাড়ীতে আগেই! আমাকে তুমি বলে ভুল করে ঠেঙ্গিয়েছে তাই! ও: হো: হো: কেন যে মরতে দাড়ী না পরে ঢুকতে গেছিলাম!—

ননী জবাব দেয় না; শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মানসীর ছবির দিকে।

চার

ননীর জীবনে এখন শনির দশা চলছে। তার মাথায় মুহূর্মুহু অশনি পাত হচ্ছে। দশা না বলে তাকে চরম দুর্দশা বলাই সঙ্গত। গত এক সপ্তাহে যা ঘটে গেছে জার্মান ব্লিৎসক্রিগেও ইংলণ্ডের এমন হয় নি। ননীগোপালের একেকবার মনে হয় তারই ওপর ভগবানের এমন অহেতুক কৃপাবর্ষণ কেন? সে তো কতবার ভগবানকে করজোড়ে জানিয়েছে যে, সে বড় কিছু ভার নেবার পক্ষে অসমর্থ। 'তোমার পতাকা আর যাকেই দাও আমাকে দিও না; ভার বইবার শক্তি দিলেও আমাকে লত্‌পত্‌ করতেই হবে।' কিন্তু ভগবান শুধু কায়স্থ নয় (ভগবান-'দত্ত' আমাদের যা কিছু; প্রতিভা-ক্ষমতা-অর্থ-পরমার্থ সব; কাজেই ভগবান ননীর মতে কায়স্থ।) তিনি অর্ধবধিরও বটে। তার কাছে একটি *baby austin* গাড়ী চাইলে, তিনি *baby austin* -এর পরিবর্তে *baby* দেন একটি করে বছরে: ফলে খরচা বাড়ে এবং *baby austin* কিনবার দুরাশা আরও দুর্দান্ত এবং সেই সঙ্গেই আরও দূরান্ত হয়।

গত সাত দিনের মধ্যেই ননীর জীবনে যে দুর্ঘটনা ঘটে গেছে তাতে সে খ্যাতনামা হ'লে খবর কাগজের দুশ্চিন্তা দূর করতে পারত, খবরাভাবের সাজ্বাতিক দুশ্চিতাও অনায়াসেই!

মঙ্গলবার দিন প্রহ্লাদের সঙ্গে সে বেরুচ্ছিলো একটি ইণ্টারভুর জন্যে। ইণ্টারভু ঠিক নয়; বড় একটি কোম্পানীর এক ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সঙ্গে প্রহ্লাদের আলাপ ছিলো; এবং সেখানে একটি চাকরী খালি হবার সম্ভাবনা ছিলো। সেই উদ্দেশ্যেই, ননীকে সেখানে, আর কেউ ভেকেন্সীর খবর পাবার আগেই, ভালো করে ভিড়িয়ে দিতে নিয়ে চলেছিলো প্রহ্লাদ।

চারফিট দশ ইঞ্চির দৈন্য মেক-আপ করতে ননী একটি আড়াই-ইঞ্চি হিলের নতুন জুতো কিনেছিলো'। সেটি পায়ে দেবার দেড় মিনিটের মধ্যে পা-হুটোকে সাঁড়াশীর মত চেপে ধরে বলতে চাইলো যে, জুতোজোড়া মাপে ছোট হয়েছে। নেহাতই ছোট। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুৎপন্নমতি ননীগোপাল দে ডবল বি. এ. হু'পাটি হু'খানা শুকতলা বার করে নিয়ে কোটের হু'পকেটে রেখে দিলো ; ব্যস ! নিশ্চিন্ত মনে এবারে বেরুনো যেতে পারে !

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে ঢুকে ননীগোপাল বোঝাতে লাগলো বিশ্বরাজনীতি ; দেশের অবস্থা ; সামাজিক পরিস্থিতি ; লীগ ইষ্টবেঙ্গল কি মোহনবাগান, কে পাবে ; কোন ইংরেজী ছবিটি হু'বার দেখার মতো ; কারবার কেমন করে চালাতে হয় ; উদয়শঙ্কর ; সাহেব বিবি গোলাম (প্রেমেন্দ্রর মিত্রের গল্প,—কল্লোলে প্রকাশিত !) ইত্যাদি। আধঘণ্টা শোনবার পর ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রশ্ন করলেন : এ্যাপ্লিকেশন এনেছো ?

হ্যাঁ, এই যে বলে কোটের পকেট থেকে ননী যা বার করে তা' দেখে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর চোখ কপালে তোলে ; প্রহ্লাদ সজোরে চিমটি কাটে। ননী 'সরি' বলে আরেক পকেটে হাত ঢোকায় !

এবারেও এ্যাপ্লিকেশনের বদলে বেরোয় জুতোর আরেক পাটি শুকতলা ! ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কী করেন দেখবার জন্যে প্রহ্লাদ আর দাঁড়ায় না।

হুর্ভাগ্যের দ্বিতীয় রাউণ্ডে এলেন ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ডাক্তার ! সেদিন সারা হুপুর বর্ষায় হুরন্ত ঘুমিয়ে বিকেল চারটে নাগাদ উঠেছে ননী সবে। তখনও বিকেলের বেড্-টি খাওয়া হয় নি। এমন সময় ননীর সেজমামা ধরে এনেছেন ডাক্তারকে ; তাঁর অবশ্য নিজের গরজ। তিনিই ননীকে দিয়ে তাঁর কোম্পানীতে ইনসিওর করাচ্ছেন। ডাক্তারী রিপোর্ট গেলে তবে পাকা হবে তাঁর কমিশন।

ননার সেজ এবং ন' দু'মামাই এজেন্ট ; এবং দু'জনেই ননাকে নিয়ে টাগ-অফ-ওয়ার করেছিলো। ন' মামা বুঝিয়েছিলো : আমাদের কোম্পানীতে ইনসিওর করবার পর মারা পড়লে, ডেথ সার্টিফিকেট পরে, তার আগেই টাকা দিয়ে দেওয়া হয়।

সেজমামা : ও আর এমন কি সুবিধে ? আমাদের কোম্পানীর পাঁচতলার বারান্দা থেকে কেউ পড়ে গেলে, যদি তার আমাদের ওখানে ইনসিওর করা থাকে, তবে পড়ন্ত অবস্থাতেই দোতলায় আমাদের জানলা গলিয়ে তার হাতে ঠিক গুঁজে দেওয়া হয়।

ননী সেজমামার ওখানেই ইনসিওর করলো। এখন ডাক্তারী পরীক্ষা হয়ে গেলেই সেজমামা 'পাশ' হয়ে যায়।

প্রথমেই গোলমাল বাধলো ননীর অবর্তমানে টাকাটা কে পাবে ? এই প্রশ্নের জন্যেই ননীর ইনসিওর করতে ইচ্ছে করে না। জীবন-বীমা করবার আগে পর্যন্ত জীবন সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তা দেখা দেয় না। কিন্তু ইনসিওরও হবার পরই সবাই ইনসিকিওর্ড্ ; জীবন-বীমা কর মাত্রই জীবন-সংশয় সুরু। ননী তাই প্রবল আপত্তি করে : এ আবার কেমন কথা ? এখনি অবর্তমান থাকার কথা উঠছে কেন ? আমার এখন নবীন যৌবন ; কত আশা—

ডাক্তার কাব্য-তোড়ের ধাক্কা সামলে উঠে বলেন : আহা-হা এক্সিডেন্টের কথা কী বলা যায় ? দৈবাৎ যদি মারা পড়েন, টাকাটা যাতে মারা না যায় সেই সঙ্গে, তাই আপনার লিখিত নির্দেশ চাই টাকাটা আপনি না থাকলে আপনি কার হাতে দিলে সব চেয়ে নিশ্চিন্ত হ'ন ?

'দৈবাৎ যদি মারাই যাই',—সেক্ষেত্রে আমার দ্বিতীয় ছেলে পাবে এই পাঁচ হাজার টাকা—ননী রাগ করেই যেন বলে।

সে কি মশাই ?—ডাক্তার লাফিয়ে ওঠেন প্রায় ; আপনার বিয়েই হয় নি এখনও,—দ্বিতীয় ছেলের কথা আসছে কোথা থেকে ?

বিয়ে হয় নি ; হবে।—ডবল বি-এ ননী ক্ষেপে যায় ; 'এবং আমার' —ননী যোগ করে : পঞ্চম স্থান ভালো ; অনেকগুলি ছেলেমেয়ে

হবে, তার মধ্যে দ্বিতীয় ছেলেকে আমি দিয়ে যাব এই টাকা; জ্যোতিষ জমিদার শ্রীমেষচন্দ্র আমাকে কথা দিয়েছেন যে, আমার দ্বিতীয় ছেলে জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, প্রতিভায় আসলে আমার অদ্বিতীয় পুত্র হবে; তাকে আমি বাপ্ হয়ে এই সামান্য টাকা ক'টা দিয়ে যেতে পারবো না? অবশ্য আমি তার আগে মারা গেলে তবেই! মারা না গেলে কাউকেই দিচ্ছি না টাকাটা; আমি বরং মেরে দেবো—

'মা'—ডাক্তার এবারে কড়া হয়; না, যে ছেলে আপনার হয় নি এখনও তাকে টাকা দেওয়া চলবে না! এমন কি আপনি যদি এমন কাউকে আপনার উত্তরাধিকারী ঠিক করে যান এই টাকার যে আপনার আত্মীয়স্বজন কেউ নয় তাহলেও চলবে না; সেক্ষেত্রে আপনাকে বিশেষ কারণ দেখাতে হবে যে তাকে কেন দিতে চান টাকা আপনার অবর্তমানে; সে ভয়ানক ঝামেলা! তার চেয়ে আপনার মা'র নামে দিয়ে যান—

টাকা দেবার সমস্যা মেটে! কিন্তু সব সমস্যার সমাধান হয় না তাতে। একটু বাদেই সমস্যা জটিলাকার ধারণ করে বরঞ্চ। ডাক্তার একটু বাদে যখন জিজ্ঞেস করেন যে ননীগোপালের শরীরে কোনও বিশেষ চিহ্ন আছে কি না, ননী তখন ভাবতে থাকে ডাক্তার কি ল্যাজ কিম্বা শিং-এর কথা বলছেন? না। ডাক্তার জানতে চান ননীর শরীরে এমন কোনও বৈশিষ্ট্য আছে কি না যা নাকি চট করে আর কারুর অঙ্গে পাওয়া শক্ত। ডাক্তার অবশ্য খোলসা করেই বলেন: আপনার সঙ্গে যাতে আর কারুর গুলিয়ে না যায় তার জন্যেই এই জিজ্ঞাসা! গুলিয়ে ওঠার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে যায় ননীর মাথা; সে-ও বলে ফেলে: আজ্ঞে হ্যাঁ; গোলানো খুবই সম্ভব! আমার আবার এক যমজ ভাই আছে কি না, তার নাম খৈনীগোপাল! হুবহু আমার মত দেখতে! মাঝে-মাঝে আমারই গুলিয়ে যায় তা পরে কা কথা। ননীর সংস্কৃতে কর্ণপাত না করে ডাক্তার স্বগতোক্তি করেন:

সর্বনাশ! এর মধ্যে আবার যমজ ভাই? তাহলে তো পরিষ্কার করে দেখা দরকার তোমার আকৃতির বৈশিষ্ট্য! তার সঙ্গে তোমার কোনও তফাত নেই? এই ধরো তোমার মাথায় আব আছে; তার মাথায় নেই! কিম্বা তোমার ছ'টা আঙুল আছে, অনেকের যেমন থাকে, বুড়ো আঙুলের পাশে আবার একটা বুড়ো আঙুল—(ডাক্তার 'তুমি-তুমি' করেই বলে এবার!)

ননী খুব সন্তর্পণের সঙ্গে নিজের হাতের আঙুল দেখতে থাকে, দেখে ডাক্তার রেগে যান: এখন দেখছ কী? যেন এই মাত্র নতুন করে গজাবে আঙুল? নিজে জান না তোমার ছ'টা আঙুল কি না?

ননী অনেক ভেবে-চিন্তে আবিষ্কার করে অবশেষে; এবং সগর্বে ঘোষণা করে নিজের পেটের দিকে অঙুলী সঙ্কেত করে: একটা টিউমার আছে বোধ হয় আমার—!

ডাক্তার: কোথায়? দেখি, দেখি—

ননী বলে, উঁহু! এক্সরে ছাড়া দেখা অসম্ভব; পেটের ভেতর কিনা! তাছাড়া ঠিক সময়ে ওষুধ পড়ে-পড়ে সেটা আবার অসময়েই সেরে আসছে।

জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ডাক্তার জানান যথেষ্ট হয়েছে, আর বৈশিষ্ট্য বার করতে হবে না!

ননী এরপর উঠে যাচ্ছিলো। ডাক্তার জলদগম্ভীরে হাঁক পাড়লেন! পেচ্ছাব করো!

ননী সামনের সেক্রেটারিয়েট টেবল, গদীমোড়া নতুন চেয়ার, সোফা কৌচ দেখিয়ে বললো: এইখানে—?

ডাক্তার হাতের ছোট বোতল দেখিয়ে বলেন: এইটেতে—বর্ষার দুপুরের ঘুমের পর ননী বোতল ভরে জলবিয়োগ করে বোতলটা এনে দিলো ডাক্তারের হাতে। টইটুম্বুর বোতলের ছিপি খোলা; ডাক্তারের হাতে দিতে গিয়ে সেই পবিত্র গঙ্গোদক পড়লো গাবাডিনের স্যুটে!

ডাক্তার ঃ ফেলে দিয়ে এসো— ! ভরে আনতে বলেছি ?

ননী ফেলতে গিয়ে পুরো ফেলে দিলো।

ডাক্তার ঃ আবার করে নিয়ে এসো।

কিন্তু এতো পূজো সংখ্যার লেখা নয় যে বসলেই আবার হবে, তাই ননী শেষকালে বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য নন্দর স্মরণাপন্ন হলো ; হতে বাধ্য হলো আর কি ! ডাক্তার শুনলেন। ননী বলছে ঃ এই নন্দ তুই কর্‌ত' !

ডাক্তার চীৎকার করে উঠলেন ঃ তোমার *examination* হবে,— নন্দ করলে কি হবে ?

ডাক্তার এবারে সবেগে প্রস্থান করেন ! মহাপ্রস্থান করেন কি না বলা যায় না !

পাঁচ

প্রত্যেকবার যেমন হয়, এবারেও তার ব্যত্যয় হলো না। বেঠিক সময়ে ঠিক সেই প্রহ্লাদ দত্ত দেখা দিলো। সে যুগে প্রহ্লাদ যতবার বিপদে পড়েছে ততবার দেখা দিয়েছে ননীচোর। এ-যুগে ননীগোপাল যতবার বিপদে পড়ে ততবার দেখা দেয় প্রহ্লাদ। সে-যুগে প্রহ্লাদকে উদ্ধার করতে আসতেন ননীচোর। এযুগে ননীগোপালের কাছে ধার করতে আসে প্রহ্লাদ।

ননীগোপালের জীবনে যতবার দুঃসময় ঘনিয়ে আসে, ততবারই প্রহ্লাদ দত্ত দেখা দেয় মূর্তিমান মুসকিল আসানের মতো। এবারও প্রহ্লাদ দত্ত দাঁত বার করে দেখা দিলো নৃসিংহ বেশে। এসে দেখলো ননী বই পড়ছে।

কী পড়ছিস? প্রহ্লাদের প্রথম প্রশ্ন।

'রবি ঠাকুরের প্রেমের কবিতা'!—ননীর শেষ উত্তর।

পড়্; শুনি। তারপর হঠাৎ সচেতন হয়ে প্রহ্লাদ বল্লে: এই শোন্,—খাবার আনা তো; ভয়ঙ্কর ক্ষিদে পেয়েছে। বেশি আনাস নি; চার পাঁচ টাকার মতো—! হ্যাঁ, এবারে পড় তো প্রেমের কবিতা—শুনি!

ননীগোপাল বসে পড়লো। বাড়ীতে খাবার ছিলো। জিজ্ঞেস কোরলো। বাইরে থেকে আনাবো না বাড়ীর খাবারই খাবি?

প্রহ্লাদ: বাড়ীতে কি হয়েছে?

ননী: তেমন কিছু নয়,—এই মটরশুটির কচুরী আর ঘুগনি আর—

প্রহ্লাদ: বেশ, ওগুলো যাবার সময় খেয়ে যাব; আমি অনেকক্ষণ আছি; তুই বাজার থেকে খান কুড়ি

হিং-এর কচুরী; আট আনার আলুরদম; আর আধসের রাবড়ী আর কালাকাঁদ দশ-বারো খানা আর—! আর কী! এই আনা; তাহলেই হবে—

ননী : এরপর তুমি আবার আমার বাড়ীর খাবারগুলো খেতে পারবে?

প্রহ্লাদ : না, তোর বাড়ীর খাবার খেতে পারবো; তবে পুরো বোধ হয় পারবো না · রাতে একটা নেমন্তন্ন আছে; তাছাড়া এখন ডায়টিং করছি বলে ডাক্তার বেশি খেতে বারণ করেছে।

ননীগোপাল রাগে কি অনুরাগে কে জানে কিছু বললো না। চাকরকে বাজারে পাঠিয়ে এসে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সুরু করলো :

'বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা'—

এক লাইন পড়তে না পড়তেই প্রহ্লাদের দিকে তাকাতেই দেখলো প্রহ্লাদ হাসতে হাসতে শুয়ে পড়েছে।

ননী : এতে হাসবার কী আছে? প্রেমটা বিপদ নয়? এর চেয়ে ভালো প্রেমের কবিতা রবি ঠাকুর লিখেছে কখনো? কোনও কবি লিখেছে কখনও?

রবি ঠাকুরের কবিতার কথা উঠলেই ননীগোপাল অধ্যাপকের মত লেকচার দিতে আরম্ভ করে। রবি ঠাকুরের সব কবিতার দুটো করে মানে; কিন্তু ননীগোপাল তা মানে না। রবি ঠাকুরের সব কবিতাই নরনারী ছাড়াও গভীরতর এক অর্থে ভগবানের উদ্দেশ্যে কথিত। ননী তৃতীয় আরেক অকথিত অর্থ আবিষ্কার করেছে যাকে তার সব বন্ধুরা অকথ্য আখ্যা দেয়, কেন তা সে বোঝে না কিছুতেই। সেদিনও ননীগোপালকে রবি ঠাকুর পেয়ে বসলো। সুবিধে হ'ল প্রহ্লাদের। ননী যত কবিতার আসল রস না কি সব যেন বোঝায়, প্রহ্লাদ ততই রসনাকে কাজে লাগায়; খেয়ে যায় বিরাম-বিহীন।

ননীগোপাল বলে : ছাখ, এই যে রবি ঠাকুরের 'একদিন চিনে

নেবে তারে', —এ-কবিতা যে তিব্বত সম্বন্ধে লেখা তা কেউ কোনদিন ভেবেছে ?

তিব্বত সম্বন্ধে ? এর মধ্যে তিব্বত আসছে কোথা থেকে ? এ্যাঁ,—প্রহ্লাদ খাবার মুখে মুখ খোলে, না খুলে পারে না বলেই আবার খোলে। ফলে সিঙাড়ার তরকারী খানিকটা ননীর গায়ে এসে পড়ে। ননী কিন্তু গায়ে মাখে না মোটেই। সে লেকচার দেয়ঃ হ্যাঁ, তিব্বত সম্বন্ধেই আসলে ঋষি কবির এই ভবিষ্যদ্বাণী; 'একদিন চিনে নেবে তারে'?—অর্থাৎ চীনেরা একদিন তিব্বতকে নিয়ে নেবে! নিলোও? নতুন চীনে তিব্বতকে না নিয়ে পারলো? পারতে পারে কখনো? কবির বাণী কখনও ব্যর্থ হয়? তারপর এই যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ

"এপথে আমি যে গেছি বারবার·········"

এর মানে কি? এ কাদের উদ্দেশ্যে রচিত। এ-হচ্ছে দাগী আসামীর আবার জেলে ফেরত আসবার সময় গাইবার। রবীন্দ্রনাথের গান সব লোকেই সব অবস্থায় গাইতে পারে। যেমন, বিকেল-বেলায় রোজ কারুর জ্বর আসছে; জ্বর আসছে এত কম এবং যাচ্ছে এত দ্রুত যে সে অবস্থা বোঝাবার জন্যে রবীন্দ্র সঙ্গীত ধার করা ছাড়া উপায় কী? রবীন্দ্রনাথের সেইঃ 'ওকি এলো? ওকি এলো না? বোঝা গেল না?'—এই গান গাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর কোথায়? কিম্বা ধরো কোনও তরুণ শিল্পী কোন্ উদ্ভট রাস্তায় চট করে বিখ্যাত হওয়া যায় ভেবে না পেয়ে যখন কাঁদছে তখন তার মনের সেই করুণ অবস্থাকে রূপ দেবার জন্যেও রবীন্দ্র নাথেরই অপরূপ একটি গান রয়েছেঃ 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না······!'—অর্থাৎ কি?—না,—যামিনী রায় সারা জীবন সহজবোধ্য ছবি এঁকে খেতে না পেয়ে কালীঘাটের পোটো স্টাইলে ছবি এঁকে রাতারাতি দ্বিগ্বিজয়ের রাস্তায় যেতে পারার আগেই আমাকে জাগালে না কেন?

রবীন্দ্রনাথের গানের আরও ব্যাখ্যা হয়তো ননীগোপাল দিত কিন্তু প্রহ্লাদ দত্তর মেসিন গানের মুখে তা উড়ে গেলো ; যেমন উড়ে যায় সুচিত্রা উত্তমের মুখে অন্য যে কোন নায়ক-নায়িকা।

প্রহ্লাদ বলল : তোমার ওসব কবিতার বিশ্ববিদ্যালয়ী ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে এখন কাজের কথা শোন—

বল—ননী স্পষ্টই দমে গেছে !

একজন জ্যোতিষী এসেছে নেপাল থেকে ; সাক্ষাত ভৃগু। তার কাছে তোকে নিয়ে যেতে এসেছি !

কী হবে গিয়ে ?—ননীর তখনও চেষ্টাকৃত নিস্পৃহ জিজ্ঞাসা—।

প্রহ্লাদ ঝোপ বুঝে কোপ লাগায় : আচ্ছা, 'কি হবে গিয়ে' যখন, তখন বলেও দরকার নেই বাকীটা।

ননী ততক্ষণে গলতে সুরু করেছে : আহা-হা, রাগ করছিস কেন ?

প্রহ্লাদ কিন্তু গলে না : না, রাগ করবার কি আছে ? তোমার কাজে লাগতে পারে এই ভেবেই এতদূর কষ্ট করে আসা ! এখন যখন তোমার এতে উৎসাহ নেই,—তখন—

বাকীটা আর না বলে আড়চোখে তাকায় প্রহ্লাদ দত্ত।

ননী অনেক সাধ্যসাধনা করে তবে প্রহ্লাদকে তুষ্ট করে। তাতেও প্রহ্লাদ মুখ খুলতো না ; কিন্তু মুখ খুলতেই হল তাকে, যখন ননী আরও আধ জাম-বাটি ঘুগনি নিয়ে এলো, বাড়ীর তৈরী।

প্রহ্লাদ তখন বললো : তোর এখন তো সময় খারাপ যাচ্ছে—

ননী : কেন ?

প্রহ্লাদ : আর কেন ? একটাও প্রেম টিঁকছে না ; মানসী গেল ; জুলেখাও !—এখন তাই এই সাক্ষাৎ ভৃগুর কাছে গিয়ে জানা দরকার তোর কপালের লেখা কি ? যদি কপালে থাকে তাহলে হবেই ! নইলে কিছুতেই না—

ননী : তা এই নেপালী ভৃগুর কাছে গেলে জানা যাবে ?

প্রহ্লাদঃ জানা যাবে মানে? শোন্ তবে? ভৃগু মানে কি জানিস? ভৃগু মানে পুরাকালের এক ঋষি; তিনি, মানুষ যতরকম গ্রহসন্নিবেশে জন্মাতে পারে, অঙ্ক কষে তার ছক আগে থেকেই তৈরী করে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের সকলের দফা সেরে রেখেছেন। তাঁর ছকের বাইরে কারুর জন্মাবার উপায় নেই; কেউ জন্মালে তা নেহাতই অবিমৃষ্যকারিতা হবে।

বুঝেছি! তার জন্মানোই ঠিক নয়,—ননী মাঝখানে ফোড়ন দেয়।

মাঝখানে কথা বলার অভ্যেস তোমার গেল না আজও? প্রহ্লাদ রেগে যায়; বেশ তাহলে তুমিই বলো বাকীটা; আমিই শুনি—

আহা-হা, রাগ করেছিস নাকি?—ননী নার্ভাস।

দেখছ রাগ করেছি, আবার রাগ করেছিস নাকি, জিজ্ঞেস করার মানে কি? হ্যাঁ, কোন্ অব্দি বলেছি?

ওই যে অবিমিশ্র—

অবিমিশ্র নয়; অবিমৃষ্যকারিতা। হ্যাঁ, সেই ভৃগুর আসল ছক শুধু নেপালে আর কাশীতে আছে; তাও আছে দু'একজনের সন্ধানে। বাকী সবাই জাল ভৃগুর কারবারী; সেজন্য তাদের কিছু মেলে না; বুঝেছ?

ননী হ্যাঁ-না কিছুই বলে না; যদি প্রহ্লাদ আবার থামে এই ভয়ে। প্রহ্লাদ এবারে কিন্তু ননী কিছু বলার জন্যে নয়, ননী কিছুই না-বলার জন্য রাগে। সঙ্গে সঙ্গে ননীর পেটে এক গোঁতা মেরে বলে: কী?—অর্থাৎ যা বল্লাম তা ঠিক কি না। এই হচ্ছে প্রহ্লাদের এক গুণ অথবা দোষ! ঠিক সময়ে যদি তাল না দিতে পেরেছ তার কথার সঙ্গে সঙ্গে সে গোঁতা মারবে পেটে: কী? আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাকে বলতে হবে: হ্যাঁ বুঝেছি। তখন প্রহ্লাদই বলবে: কিস্সু বোঝ নি। অথবা বলবে: কচু বুঝেছ! আজও তার ব্যত্যয় হবার কোনও সম্ভাবনা দেখা গেলো না।

আগে আগে ননীর খেয়াল থাকতো ঠিক কোন্ সময়ে 'হুঁ' দিতে

হবে; অথবা ঠিক কোন্ সময় প্রহ্লাদের সেই মারাত্মক 'কী'-র গোঁতা আসবে। সেই বুঝে ননী সরে যেত। কিন্তু ইদানীং অনেককাল প্রহ্লাদের সংস্পর্শ বঞ্চিত ননী ভুলে গিয়েছিলো; ফলে গোঁতা খেয়ে 'অঃ' করে উঠলো ননীঃ বুঝেছি; তোমার ইনি হচ্ছেন আসল ভৃগু!

কচু বুঝেছ! প্রহ্লাদ তার স্বভাবসিদ্ধ উক্তি করে; এবং তারপরঃ 'কিস্সু বোঝ নি'—এই বলে তার স্বভাবসিদ্ধ পুনরুক্তি করে!

কেন? এবারে এতক্ষণে ননীও তেতে ওঠে; কেন? বুঝিনি কেন? কি বুঝিনি আমি?

ইনি আসল ভৃগু নন; আসল ভৃগু মারা গেছেন অনেকদিন; সেই আসল ভৃগুর আসল কাগজগুলো অব্দি মারা যাচ্ছিলো যদি এঁর হাতে এসে না পড়তো! এই নেপালী ভৃগুর কাছেই একমাত্র সেই আসল ভৃগু আছে। আসল ভৃগু মানে যে কাগজে প্রথম স্বয়ং ভৃগু খসড়া করেন, সেই আসল কাগজের নকল বা *true copy* নয়; অরিজিনাল। যে কাগজে ভৃগু নিজের হাতে লিখে গেছেন তাঁর সেই হস্তাক্ষর সুদ্ধ আসল কাগজ কখানাই এঁর কাছে রয়েছে; রবীন্দ্রনাথের রচনার পাণ্ডুলিপির ফটোস্ট্যাট অর্থাৎ প্রতিলিপি নয়; খোদ পাণ্ডুলিপিটাই এঁর দখলে—বুঝেছ এবারে?

'না'—ননী খুব সংক্ষেপে জবাব দেয়; খুব ক্ষেপে গেলে মানুষ যেমন দাঁত চেপে সংক্ষেপে বলে ঠিক তেমনি করে ননী শুধু বললেঃ না!—এক কথায় নাকচ করে দিলো প্রহ্লাদের সব কথা; স্বয়ং হিরণ্যকশিপুর মতো।

না কেন? প্রহ্লাদ বুঝতেই পারে না; বিধান রায়ের মতো বিরোধী পক্ষের না বুঝতে পারাটা তার বোধগম্য হয় না!

ভৃগুর সময় কাগজ ছিলো? ননীগোপাল বিরোধী পক্ষের নেতা জ্যোতি বসুর মতো লাফিয়ে পড়ে প্রায়।

এ্যাঁ? মানে—আমতা আমতা করে প্রহ্লাদ আধা মন্ত্রীদের মতো।

এ্যাঁ—এ্যাঁ নয়! মানে নেই তোমার কথার। ভৃগুর সময় কাগজ আবিষ্কারই হয় নি। কাগজ তো এসেছে চীন থেকে। ১৭৬৩ সালে ইয়াংপো বলে এক চৈনিক শিল্পী প্রথম বাঁশী বাজাতে বাজাতে বাঁশের কথা ভাবেন; তারপর বাঁশ থেকে কাগজের কথা ভাবেন। তাঁর এক শ্রোতা লিংপু। এ সম্বন্ধে রীডার্স ডাইজেস্টের লেটেস্ট ইস্যুতে হ্যারি ল্যাবার্টের প্রবন্ধ: *Solar influence on Polar region from the advent of life on earth's eastern hemisphere as studied by Socrates in the light of manner described antidisestablishmentariantistically by Pope.*—এতে অপ্রাসঙ্গিকভাবে কাগজের প্রথম আবিষ্কারের কথাও এসে পড়েছে; এবং সেই প্রসঙ্গেই ওই কথা বলেছেন তিনি।

নিজের রাস্তায় এসে পড়েছে ননীগোপাল দে ডবল বি-এ। এখন সে ননীগোপাল দে ডবল বি-এ না দেবজ্যোতি বর্মন আটবার এম-এ না বিনয় ঘোষ 'পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি'র লেখক বোঝা শক্ত। সব গুলিয়ে একাকার হয়ে গিয়ে মূর্তিমান এনসাইক্লোপিডিয়া মনে হচ্ছে তাকে। কিন্তু ঘাবড়ায় না প্রহ্লাদ। হিরণ্যকশিপুতেই ঘাবড়ায় নি; আর এত ননীগোপাল!—শ্রীকৃষ্ণেরই আরেক নাম। রিডার্স ডাইজেস্টের কথা যে ননী তুলবেই তা প্রহ্লাদ জানতো; যখনই যেখানে তর্ক হয় ননীগোপাল তখনই সেখানে এমন একটি মারাত্মক প্রবন্ধের উল্লেখ করে বলে, রিডার্স ডাইজেস্টের লেটেস্ট ইস্যুতে বেরিয়েছে।

আজ চ্যালেঞ্জ করে বসলো প্রহ্লাদ: কই দেখি রিডার্স ডাইজেস্টের লেটেস্ট ইস্যু? নিয়ে আয়।

ননীগোপালেরও উত্তর তৈরী: পাশের বাড়ীতে নিয়ে গেছে; কাল ফিরিয়ে দেবে; তোকে দেখাব তখন—।

না। কোনও বাড়ীতে কেউ নিয়ে যায় নি; ফিরিয়েও দিয়ে যাবে না কেউ কখনও। তোমার কাল, রিডার্স ডাইজেস্ট দেখবার

বেলায় মহাকালে গড়িয়েছে বরাবর। এরপর তুমি কখনও ওই রিডার্স ডাইজেস্টের কথা তুলতে পারবে না।—মনে থাকে যেন।

বেশ, রিডার্স ডাইজেস্টের কথা তুমি বিশ্বাস যদি না কর, বলব না। ননী হেরে যাবার কোনও লক্ষণ না দেখিয়ে বলে; আমি একটু পড়াশুনো করি সেটা বোধ হয় আমার অপরাধ; যাক। রিডার্স ডাইজেস্ট না বললেও এটা তো সত্যি, যে ভৃগুর সময়ে কাগজ বলে কোনও বস্তু ছিলো না? না কি তাও তুমি মানো না?

ওরে গাধা, কাগজ মানে কাগজের বদলে ভৃগু যাতে লিখেছিলেন সেগুলোর কথাই বোলতে চাইছিলাম; তুই বুঝবি না বলে কাগজ বলেছিলাম—। রিডার্স ডাইজেস্টে তো ভৃগু যাতে লিখতেন সে সম্বন্ধে কিছু নেই, আর রিডার্স ডাইজেস্টে না থাকলে তুই তা বুঝবিও না; তাই সহজে বোঝাবার জন্যেই কাগজ কথাটা ব্যবহার করেছিলাম; না হলে সবাই জানে, তোমার হ্যারি ল্যাবার্ট ছাড়া, যে ভৃগুর সময়ে লোকে কাগজে লিখত না; লিখত—

প্রহ্লাদের কথা শেষ করতে না দিয়েই ননী জানাতে যায় যে সেও জানে; ফলে তার মুখ দিয়ে বেরোয়ঃ

'শালপাতায়'!

শালপাতায় নয়; তালপাতায়—

হ্যাঁ; হ্যাঁ, তালপাতায়! লিখতো বোধ হয় বগের কলমে—

বগের নয়; খাগের কলম বলে তাকে!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাগের কলমে—

যাক যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছ, এবারে একটা কথা বলি তোমায়; একটু আগে শালপাতা বলেছিলে না? শালপাতায় লোকে লেখে না; শালপাতায় লোককে অনেক সময় খাবার জিনিষ দেওয়া হয়; তোমার মুখে শালপাতা শুনে খাবার কথা মনে পড়ে গেল; তাছাড়া এতক্ষণ যা বকিয়েছ তাতে আমার মত লোকেরও ক্ষিদে পাওয়া ছাড়া আর কি পেতে পারে? যাও; আরেকটু ঘুগ্‌নি নিয়ে এস—

শেষবারের বার ঘুগ্‌নি খেয়ে যাবার সময় প্রহ্লাদ্‌ বলে গেল সে পরের দিন সকালে এসে ননীকে সঙ্গে নিয়ে নেপালী ভৃগুর কাছে যাবে ; ননী যেন তৈরী থাকে সাড়ে সাতটার মধ্যে।

একটু আসতে দেরী হয়ে গেলো, না ?—বলে প্রহ্লাদ যখন এসে ঢুকলো, তখন সাড়ে আটটা বেজে গেছে। ননীর বাড়ীতে আরেকবার চা এবং তার সঙ্গে ডালের বড়া খেয়ে যখন ননীকে নিয়ে প্রহ্লাদ বেরুলো তখন দশটা বাজে প্রায়। বাস থেকে পাঞ্জাবী কণ্ডাক্টার তখন অবিরাম ডেকে যাচ্ছেঃ আ যাইয়ে ; একদম খালি হ্যায়!—অর্থাৎ বাসের ভেতর তখন আঁচিল ধারণেরও স্থান নেই। ট্রামের অবস্থা আরও ভয়াবহ ; মান্থলীরা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে, ঝুলে, সেকেণ্ডক্লাসে অথবা উল্টো দিক থেকে ঘুরে যাচ্ছে। দেখেই মাথা ঘুরে যাচ্ছে ননীর ; কিন্তু প্রহ্লাদের নয়। এই, ট্যাক্সী,—বলে ট্যাক্সীতে উঠে বসেছে ননীকে নিয়ে। প্রহ্লাদের ট্যাক্সীতেও আপত্তি নেই ; এরোপ্লেনেও নয়। শুধু সঙ্গে ভাড়া দেবার লোক একজন থাকলেই হলো। যে রাস্তায় নেপালী ভৃগুর বাসা সে রাস্তা লম্বায় পাক্কা আড়াই মাইল ; বাড়ীর নম্বর একশ' একত্রিশের 'এ'। ঠিক কোন জায়গায় একশ' একত্রিশ হবে বলা শক্ত। রাস্তার মাঝ বরাবর হতে পারে ; একেবারে পূব অথবা একেবারে পশ্চিম প্রান্তে হওয়াও বিচিত্র নয়। এবং ট্যাক্সীতে করে যদি নম্বর খুঁজে বার করতে হয়, তাহলে বোধ হয় একটা মিটারে কুলোবে না ; ডবল মিটার লাগবে। এই জন্যেই বোধ হয় লোকে বলে থাকে, ননীর এই মুহূর্তে হৃদয়ঙ্গম হয়, যে মিটার অর্থাৎ মিত্র কারুর বন্ধু নয়।

ট্যাক্সী করে যেতে যেতে বাসের আর ট্রামের ভীড়ের দিকে তাকিয়ে ননীর মনে হল কলকাতায় কিছু লোক বোধ হয় আজকাল ট্রামে বাসেই থাকে। বাসার অভাবে ট্রামে-বাসেই তাদের থাকা বসা দাঁড়ানো

এবং একান্তভাবে ক্লান্ত হলে ঝিমিয়ে নেওয়া একটু। নাহলে ভোরের *first* গাড়ী থেকে রাতের *Last car* পর্যন্ত সব গাড়ীতেই সব সময়েই মানুষ কেন বাছুড় ঝোলা হয়ে ঝুলবে? এর মধ্যেই কোন্ এক জায়গায় প্রহ্লাদের চীৎকার ঃ বাঁধকে! (প্রহ্লাদের ধারণা সে বাসে আছে) এবং তার পরমুহূর্তেই তার শুদ্ধিপত্র ঃ রোখ্‌কে! রোখ্‌কে! প্রহ্লাদ গাড়ী থেকে নেমে বললো ঃ তুই বোস · দেখে আসি এখানেই হবে কিনা! প্রহ্লাদ নেমে এগিয়ে যাওয়া মাত্রই ননীরও ট্যাক্সী থেকে দ্রুত অবতরণ; তাড়াতাড়ি ভাড়া চুকিয়ে, ট্যাক্সীকে হাওয়া করে দিয়ে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা তার!

সামনের চায়ের দোকানের নম্বর হচ্ছে একশ' চৌত্রিশ। পুলকিত হল প্রহ্লাদ ও ননী; তু'জনেই। যাক! কাছাকাছিও কোথাও হবে তাহলে! প্রহ্লাদ অবশ্য শুধু পুলকিত নয়, গর্বিতও হল। হবার কথাও তার। একশ চৌত্রিশ নম্বর পাওয়া গেছে; একশ একত্রিশের 'এ' আর কতক্ষণ পেতে। ট্যাক্সীতে যেতে যেতেও ঠিক চোখরাখা নম্বরের ওপর, এ কম কথা নয়?

প্রহ্লাদ ননীকে বললো ঃ দেখলি? একে বলে অন্তর্দৃষ্টি! চোখ বুঁজে চললেও ঠিক জায়গায় এসে আমার চোখ খুলবেই!

ননী কিছু বললো না। বললে, আরও কথা এবং সেই সঙ্গে বেলা বাড়বে।

চায়ের দোকানে গিয়ে জানা গেলো এ-ফুটপাথের সমস্ত নম্বর জোড় সংখ্যার। উল্টো দিকের ফুটপাথে বিজোড় নম্বর সব। এতে ঘাবড়ালো না প্রহ্লাদ। সে আশ্বাস দিলো ননীকে ঃ উল্টো দিকের ফুটপাথে হলেও এই চায়ের দোকানের নাক বরাবর ঠিক উল্টো ফুটপাথেই হবে; হাঁটতে হবে না বেশী!

কেন? ননীর প্রশ্ন!

কেন আবার? চায়ের দোকানের নম্বর দেখছিস না একশ' চৌত্রিশ? তাহলে উল্টো দিকের ফুটপাতেও এর কাছ বরাবরই নম্বর

হবে নিশ্চয়ই ; কারণ এ-ফুটপাথ আর ও-ফুটপাথের মধ্যে তফাত তো শুধু জোড় আর বিজোড় নম্বরের। এ-ফুটপাথের এখানে যখন জোড় নম্বর একশ' চোত্রিশ পাওয়া গেছে তখন এর উল্টো ফুটপাথেই একখানা দু'খানা বাড়ী এদিকে-ওদিকেই আমাদের একশ' একত্রিশের-'এ' পাবোই। পাবো না ?

নিশ্চয়ই! ননী উৎসাহ দেয়।

উল্টো দিকের ফুটপাথে নাক বরাবর পৌঁছতে হল না; দূর থেকেই দেখা গেলো; প্রকাণ্ড পার্ক একটা।

এই মেরেছে!—প্রহ্লাদের মুখ ফসকে সুধীন দত্তর স্বগতঃ শোনা যায়: এযে দেখছি পার্ক—

কোথায় পার্ক? ননী আঙুল দিয়ে দেখায়: *No Parking*।

দূর মুখ্যু! পার্কিং-এর কথা বলছি না; সামনে দেখছ না ধূ ধূ করছে মাঠ—

এরই আশেপাশে কোথাও একশ' একত্রিশের-এ হবে বোধ হয়! হবে না?

নিশ্চয়ই!—এবারে প্রহ্লাদ উৎসাহ দেয়।

প্রথমে পার্কের ডানদিক বরাবর আধ মাইল হাঁটবার পর ননী ও প্রহ্লাদ আবার পার্কের কাছে ফিরে আসে। এবারে বাঁদিকে এগোয়। পার্কের গা দিয়েই উত্তর দিক বরাবর রাস্তা চলে গেছে। রাস্তা পার হতে গিয়ে প্রহ্লাদ থমকে দাঁড়ালো; বেহারী সেপাই একটা ষাঁড়ের শিং ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এতদিন দেখে এসেছে পুলিশের হাল্লা বেরুলে গরু-মোষ ধরে নিয়ে যায়; ষাঁড়েদের নিয়ে যায় জানতো না। ননীকে প্রহ্লাদ বলল: দেখেছিস?

কী?

ওই দেখ! ষাঁড় ধরে নিয়ে যাচ্ছে—! কী হবে এখন?

কী হবে আবার? ননী অবাক হয়; ষাঁড়কে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে আমাদের কী?

প্রহ্লাদ বলল ঃ যদি তোকেও নিয়ে যায়—

ননী কিছু বললো না ; কটমট করে তাকালো শুধু। বেহারী সেপাইটা বোধ হয় শুনতে পেয়েছিল এদের কথাবার্তা ; বললো ঃ নেহি সাব, হাল্লা নেহি।

ননী জিজ্ঞেস করলো ঃ তব্?

'উধর দেখিয়ে—। সেপাহী দেখিয়ে দিলো সাইনবোর্ডে লেখা ঃ NO HORN AREA।

সত্যিই তো। সিংওলা কোনও জন্তুর এরাস্তায় ঘোরা নিষেধ ! নিজের মাথায় একবার প্রহ্লাদের অজান্তে হাতও বুলিয়ে নিলো ননী !

রাস্তা পার হয়ে বাঁ-ফুটপাথে এক দোকানের সাম্নে এসে দাঁড়ালো দু'জন।

প্রহ্লাদ জিজ্ঞেস করলো দোকনদারকে। আচ্ছা, একশ' একত্রিশের-'এ' কোথায় হবে বলতে পারেন ?

বলা শক্ত।—ক্রেতা শূন্য সেই দোকানের বিক্রেতার বিরক্তির উত্তর।

কেন, বলা শক্ত কেন ?—ননী জেরা করে ঃ উল্টো দিকের চায়ের দোকানের নম্বর হচ্ছে, একশ' চৌত্রিশ ; ও ফুটপাথে হল জোড় নম্বরের ; তাহলে ওই দোকানের উল্টো ফুটপাথের আশেপাশেই অর্থাৎ আপনার ওই দোকানের নম্বর হওয়া উচিত একশ' একত্রিশের-এ। তাই হওয়া উচিত নয় ?

না।—এবারে দোকানদার বলে ঃ কে আপনাকে এমন প্রাঞ্জল করে বুঝিয়েছে একথা ?

ননী বলতে যাচ্ছিলো ঃ আমার এই বন্ধু প্রহ্লাদ দত্ত। বলল না ; কারণ বলতে পারলো না। তার আগেই দোকানদার আবার বলে বসেছে ঃ যে বুঝিয়েছে আপনাকে এসব কথা সে একটি বুদ্ধু।

ননী ঃ আজ্ঞে, তা হতে পারে।

দোকানদার ঃ হতে পারে নয় ; নিশ্চয়ই। আমার এই দোকানের নম্বর হচ্ছে একানব্বই ; তাহলে আপনার বন্ধুর মতে এঁর ঠিক উল্টো দিকে ওই ফুটপাথেই বিরানব্‌বই হওয়া উচিত ; তাই না ?

ননী ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ—

দোকানদার ঃ না ; বিরানব্বই নম্বর হচ্ছে এখান থেকে উল্টো-দিকের ফুটপাথ ধরে ডান দিক বরাবর আড়াই মাইল রাস্তা ; সেই শ্মশানের কাছাকাছি—

শ্মশানের কাছাকাছি শোনা মাত্র ননী আর দাঁড়ালো না। প্রহ্লাদকে পেছনে রেখে দৌড়তে আরম্ভ করল।

একটু বাদে পাওয়া গেলো আরেকজনকে। রাস্তা পার হয়ে আবার ডানদিকের ফুটপাথ বরাবর কিছুদূর এগুতে না এগুতেই আবার পাওয়া গেলো একজনকে দাঁড়িয়ে আছে বাইরের গেটে। তাকে দেখে মনে হলো প্রহ্লাদের এ বোধ হয় বলতে পারে একশ' একত্রিশের-'এ' কোথায় হবে! জিজ্ঞেস করা হল তাকে ঃ একশ' একত্রিশের-'এ' কোথায় হবে বলতে পারেন ?

কোন রাস্তা ?—জিজ্ঞেস করল পাল্টা সেই উত্তরদাতা।

এই রাস্তা—প্রহ্লাদের জবাব।

এই রাস্তা বললে তো হবে না ; এরাস্তা লেন আছে, নর্থ আছে, সাউথ আছে যে!

প্রহ্লাদ এবারে আরও উৎসাহিত হয়ে বললো ঃ আজ্ঞে আমাদেরটা নর্থ-ই।

হ্যাঁ, তাহলে এই রাস্তাই—! লোকটা এবারে জিজ্ঞেস করলো আবার ঃ কার বাড়ী ?

কার বাড়ী তা তো জানি না—ননী উত্তর দিলো বিনীত ভাবে।

ওই চায়ের দোকানটায় খোঁজ নিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ!

অঃ'—ভদ্রলোক আক্ষেপ কি আশঙ্কিত জবাব পেলেন বলে কিসের

জন্যে আওয়াজটা করলেন বোঝা গেল না। পোস্টাপিসে খবর করেছেন?—অবশেষে আবার আরেক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে প্রমাদ গুণলো প্রহ্লাদ আর ননী—দু'জনেই।

পোস্টাপিস কোথায় তা তো জানি না!—ননীই দু'জনের হয়ে জানায়।

'অ' আবার সেই আক্ষেপের কি ক্ষেপে যাওয়ার কিসের পূর্ব অথবা অপূর্বাভাস, বোঝা যায় না। 'হুম্'—এতক্ষণে লোকটা নিজের স্বর পরিবর্তন করে। আবার আশার সঞ্চার হয় প্রহ্লাদের মনে। ননীর মনেও। তাহলে এতক্ষণে বোধ হয় এমন কোনও সঙ্কেত মাথায় এসেছে ভদ্রলোকের যে সঙ্কেত গুহার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আলিবাবার কানে এসেছিলো। ননী আর প্রহ্লাদ দাঁড়িয়ে থাকে; ভদ্রলোকও। একটু বাদে আরেক দ্বিতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হয়; তার সঙ্গে জমে যান ভদ্রলোক। অবশেষে একসময়ে প্রহ্লাদ প্রশ্ন করে: আমাদের ঠিকানাটা?—

বলতে পারব না তো;—মাত্র এইটুকু বলে দ্বিতীয়জনকে নিয়ে সেই অদ্বিতীয় ব্যক্তি উধাও হয়।

আবার পথ চলার আনন্দে পথ চলে দুই বৈরাগী। ননীগোপাল দে ডবল—বি. এ. এবং প্রহ্লাদ দত্ত। কিছুদূর এগিয়ে পেছনে তাকাতে গিয়ে প্রহ্লাদ থেমে পড়লো।

কী হল?—ননী বিরক্ত হয়: আর কাউকে ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে হবে না; খুব হয়েছে!

প্রহ্লাদ ননীর গুঁতোয় এক পা এগোয়; পেছনে তাকায়; আবার থামে ননীও এবারে দাঁড়িয়ে যায়। কী ব্যাপার? পেছনে তাকিয়ে ননী দেখে একতলার রাস্তা থেকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় বাইরের ঘরে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে একটি পনের-ষোল বছরের ফুটফুটে মেয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। প্রহ্লাদ হাঁ করে তাই দেখছে। একবার ভাবছে, না; অন্য কাউকে ডাকছে বোধ হয়; আবার দেখছে তারা

মেয়েটি হাতছানি দিয়ে ডাকছিলো না; ইয়ো-ইয়ো খেলছিলো। হাতের আঙুলে সুতো বাঁধা; তারই টানে উঠে আসছিলো লাট্টু ওপরে আর ছেড়ে দিতেই নেমে যাচ্ছিলো সড়সড় করে। জানলার বাইরে থেকে লাট্টুটা দেখতে না পাবার ফলেই হাতের ওঠা-নামায় মনে হচ্ছিলো বুঝি মেয়েটা তাদের ডাকছে! খুব রক্ষে বাবা! আরেকটু হলেই ফাঁদে পা দিয়েছিলো প্রহ্লাদ আর ননী। এবং এফাঁদ থেকে আর বেরুতে হত না আজ; বেরুলেও বাড়ী যেতে হত না হেঁটে বা বাসে; স্ট্রেচারে করে যেতে হত হাসপাতালে। যাক! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো তু'জনের। তারপর কড়া নাড়লো নেপালী ভৃগুর দর্শন লাভের প্রত্যাশায়।

দরজা খুলে দিলেন এক ভদ্রলোক! কাকে চাই?—

নেপালী ভৃগু এই বাড়ীতে এসে উঠেছেন? জিজ্ঞেস করলো তু'জনেই যুগপৎ।

দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিতে দিতে ভদ্রলোক জবাব দেন: পাশের গলি দিয়ে এবাড়ীর পেছন দিকে যান।

তখনও নেপালী ভৃগুর দরজা বন্ধ। ঘরে লোক গিসগিস করছে। ভৃগুর প্রধান তুই শিষ্য জানালো: বাবা এখন পূজোয় বসেছেন। দেড়ঘণ্টা হয়ে গেছে। দরজা খুলবে আরও দেড়ঘণ্টা বাদে।

ননী এবং প্রহ্লাদের নাড়ী-ভুড়ী পর্যন্ত ক্ষিদেয় হজম হয়ে যাবার জোগাড়। কিন্তু এতদূর এসে ফিরে যাওয়া যায় না। ননী ভাবছিলো বাইরে কোনও চায়ের দোকানে কিছু খেয়ে আসবে কিনা। কিন্তু তার উপায় নেই। সবাইকেই বসতে হয়েছে কিউ দিয়ে। উঠে গেলে আবার শ'খানেক লোকের পেছনে গিয়ে বসতে হতে। যখন তাদের ডাক আসবে ততক্ষণে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে বাবার। কাজেই পাদমেকং ন গচ্ছামি। বাহান্নজনের পেছনে, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা

দু'জন ছাড়া আর কেউ তো ধারে কাছে নেই! তাহলে? যাবে? না যাবে না? ননী পরামর্শ দিলো পালিয়ে যাবার জন্যে; বেপাড়ায় সাজ্ঘাতিক মার খেয়ে জখম হতে সে কিছুতেই রাজী নয়। প্রহ্লাদ কিন্তু নড়তে পারে না। রসে বসে যাওয়া মাছির মত ছটফট করে শুধু! মনে পড়ে: *Only the brave deserves the fair!*

একটু পিছিয়ে এসে থামে প্রহ্লাদ। আবার দেখে। না; মেয়েটা তাদেরই কাউকে ডাকছে। হঠাৎ দুঃখে ভেতরটা হু-হু করে ওঠে ননীর। হয়তো মেয়েটার বাড়ীতে সাজ্ঘাতিক কোনও বিপদ হয়ে থাকবে; হয়তো ছোটভায়ের হাত ভেঙ্গে গেছে; হয়তো ডাক্তার ডাকবার লোক নেই। নিরুপায় হয়ে তাদের ডাকছে; আর তারা ফিরে যাবে কাপুরুষের মতো? না; কিছুতেই না। মার খেয়ে মরে গেলেও নয়। মরে তো একদিন যেতেই হবে; আর মৃত্যু পুরুষের একবারই হয়। কাপুরুষের হয় বহুবার। সেক্সপীয়রের কথা মনে পড়লো ননীগোপাল দে ডবল বি-এর এই মুহূর্তে: *Only (Noel) cowards die many times before their death.*

আরও দু'পা পিছিয়ে আসতেই প্রহ্লাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো: এইতো একশ' একত্রিশের-'এ'। ননীও তাকিয়ে দেখলো: আরে, তাইতো! মেয়েটি যে বাড়ী থেকে তাদের ডাকছিলো বলে মনে হচ্ছে সেই বাড়ীরই গায়ে জ্বলজ্বল করছে, '১৩১-এ'! যাক; সুবিধেই হলো তাহলে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন; নেপালী ভৃগুর কাছে যাবার পথেই কুষ্ঠী জুতের দেখা যাচ্ছে। এখন আর বাড়ীতে ঢুকলেও মার খাবার ভয় নেই। তারা তো আর এখন মেয়েটার কাছে যাচ্ছে না; তারা যাচ্ছে নেপালী ভৃগুর কাছে। ওই তক্কে মেয়েটাও সত্যি সত্যি তাদের ডাকছিলো কি না তাও জানা হয়ে যাবে। গেটের কাছ পর্যন্ত ননী আর প্রহ্লাদ এগুতে না এগুতে মেয়েটা পালিয়ে গেলো জানলা থেকে দৌড়ে। এবং সেই সঙ্গেই, তদণ্ডেই পরিষ্কার হয়ে গেলো ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তর রহস্যোপন্যাসের সব সাস্‌পেন্স।

তিরানব্বাই এই ভেবে বসলো ননী আর প্রহ্লাদ। বসেই রইলো। এমন সময় এলো একটি ছ-সাত বছরের ছেলে ; জীবন্ত ফুটবল। গলায় ঢোলের মতো প্রকাণ্ড একটা মাতুলী। সকলেরই নজর গিয়ে পড়লো তার দিকে।

এই খোকা, তোমার গলায় এত বড় মাতুলী কেন ?—কে একজন যেন জিজ্ঞেস করে।

বাবা দিয়েছে ?—খোকা জানায়।

তোমার বাবা ?

না ; না। নেপালী বাবা—

সবাই উৎসাহিত হয়ে ওঠে। কী জন্যে দিয়েছেন ? জিজ্ঞেস করে এবারে অনেকে মিলে।

খোকা বললো এবারে ; সব খুলে বললো ঃ আমি জন্মাই আর মরে যাই। জন্মাই আর মরে যাই। এইটা দেবার পর থেকে আর মারা যাই না—।

দুটোর সময় বাবার ধ্যানভঙ্গ হলো। বাইরের ঘরে এসে বসলেন সোয়া দুটোর সময়। রক্তজবার মতো লাল দুটো চোখ ; কারণে কি অকারণে বোঝা গেলো না। সমস্ত গলায় আঠার বিশটা মড়ার খুলির মালা। দেখেই ননীগোপাল নিজের মাথায় হাত দিয়ে দেখলো তার খুলিটাও নেপালী বাবার গলার মালায় কিনা। নেপালী বাবার আসন হচ্ছে বাঘের চামড়া ; পাশে ত্রিশূল ; খালি গায়ে সাদা পৈতে ; দু'হাতে ধরা গাঁজার কল্কে টানার আরামে প্রায়ই চোখ বুঁজে আসছে। উপস্থিত লোকদের এবং স্ত্রীলোকদের অবশ্য আরামে বসা মুহূর্তে অন্তর্হিত ; কলকাতাতেই কাশি প্রাপ্তি। নেপালী বাবা কথাবার্তা বলেন বাঙলাতেই। বাবা আসলে বাঙালী ; অল্পবয়সে নেপালে চলে গিয়েছিলেন। সিদ্ধি প্রাপ্তির পর বাঙালীদের উপকার করবেন বলে

ফিরে এসেছেন। আবার চলে যাবেন; পাশেই বসে আছে দুই সাকরেদ। একটা প্রশ্নের উত্তরে দশ টাকা আগেই নিয়ে নিচ্ছে। প্রশ্ন করতে হয় না; বাবা মুখ দেখেই বুঝে নেন।

প্রথমে একজনকে বললেন; বড্ড বিপদে পড়েছ, না?

দর্শনার্থী: বড্ড বিপদ। একজন—

নেপালী বাবা: কিরকম দেখতে সেই একজন? কালো? লম্বা?

দ: আজ্ঞে না। মোটা; ফর্সা—

নে: হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাহলে সেই হবে।—কী করে? কালো কোনও জিনিষের কারবার?

দ: আজ্ঞে না। তুলোর কারবার করে—

নে: তুলো অনেকদিন গুদামে থাকলে কাল্‌চে মেরে যায় না?

দ: হ্যাঁ-হ্যাঁ; বাবা যখন বলেছেন—

নে: যা। তোর তেমন সাজ্ঘাতিক বিপদ কিছু হবে না। হলে জানবি মক্কেলের ইচ্ছেয় হয়েছে! করবার নেই কিছু—

দ: মক্কেল কে বাবা?

নে: মক্কেল কে? তা যদি তোদের দেখাতে পারতাম! তিনিই তো সব—ওপর দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করে বাবা এবার বলেন: তোরা যাকে ভগবান বলিস, আমি তাঁকে আদরের নাম দিয়েছি মক্কেল। মক্কেল ডোবালে কি করতে পারি বল? আমি তো আধ্যাত্মিক এ্যাটর্নী মাত্র।

বাবা যে এ্যাটর্নী তা' প্রত্যেক মুহূর্তে মালুম হয়; কারণ বাবার চেলা দু'জন বাবা যতবার জিজ্ঞেস করেন ততবার প্রশ্নগুলি দর্শনার্থীর ঘাড়ে চাপিয়ে দশটাকা করে আগেই নিয়ে নেয়। জিজ্ঞাসু সেই ব্যক্তি বাবা আবার কিছু জিজ্ঞেস করে বসেন এই ভয়ে সরে পড়ে।

এবারে দ্বিতীয় আরেকজনকে বাবা ধরেন: তোমার কী বাবা?

দ্বিতীয় জন: আজ্ঞে আমার ইলেকশন!

বাবা: একা দাঁড়িয়েছ না দলের হয়ে?

দ্বি জ: একা!

বাবা ঃ কত টাকা খরচ হচ্ছে ?

দ্বি জ ঃ প্রায় পঞ্চাশ হাজার !

বাবা ঃ তুমি ছাড়া আর কজন দাঁড়িয়েছে ?

দ্বি জ ঃ আর দুজন—

বাবা ঃ তাদের অবস্থা কি রকম ?

দ্বি জ ঃ পয়সা কড়ি বিশেষ নেই—

বাবা ঃ ভোট কত ?

দ্বি জ ঃ মোট প্রায় আটষট্টি হাজার ; পড়বে প্রায় তিরিশ-বত্রিশ হাজারের মতো।

বাবা ঃ জিতে যাবি।

দ্বি জ ঃ কী বলছেন বাবা ?

বাবা ঃ জিতে যাবি।

দ্বি জ ঃ যদি না জিতি—

বাবা ঃ বলছি জিতে যাবি! বিশ্বাস হচ্ছে না—?

দ্বি জ ঃ ছিঃ, কীযে বলেন বাবা? আপনাকে বিশ্বাস করব না?—তবে জানেন তো ভোটের ব্যাপার! তাই বারবার মনে প্রশ্ন ওঠে,—যদি না জিতি ?

নেপালী বাবা এবারে রেগে যান। বলেন ঃ যদি না জিতিস তাহলে হেরে যাবি!

দ্বিতীয় জন সরে পড়ে অতঃপর।

বেলা সাড়ে-তিনটের সময় ননীগোপালদের ডাক পড়ে। ডাক পড়বার পর ননীর খেয়াল হয় তার প্রশ্নই ঠিক হয় নি যে এখনও। এখন উপায়? নিরুপায়ের উপায় হন নেপালী বাবা নিজেই। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি নিজেই প্রশ্ন করেন অতঃপর।

নেপালী বাবা ঃ কী জিজ্ঞেস করবি ভেবে পাচ্ছিস না এই তো?

ননী রীতিমতো চমকে ওঠে। বাবা তাহলে সত্যিই মনের কথা টের পান তো। রবি ঠাকুরের সেই একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে গানের মত বাবার পায়ে মনে মনে ননীর মাথা লুটিয়ে পড়তে চাইলো। কিন্তু ততক্ষণে বাবা আবার জিজ্ঞেস করেছেন। তোর বয়স কত রে?

ননীগোপাল দে ডবল বি-এ,। হিসেব করে বলে: চব্বিশ।

তাহলে,—নেপালী বাবা এইটুকু বলে চোখ বোঁজেন। তারপর চোখ খুলে আবার বলেন: তোর বয়েস এখন চব্বিশ? তাহলে তোকে আজ একটা কথা বলে f চ্ছি; পাঁচ বচ্ছর বাদে মিলিয়ে নিস আমার কথা,—দেখবি অব্যর্থ মিলে যাবে; ইচ্ছে করলে তুই লিখে নিতে পারিস আমার কথা, যা বলে দেব এখন তার আর মার নেই—! নেপালী বাবা ফের চোখ বোঁজেন। সবাই এতক্ষণে উৎকণ্ঠ হয়ে ওঠে। ননীর বুকের মধ্যে হাতুড়ীর ঘা পড়তে থাকে। কী বলে দেবে এতগুলো লোকের সামনে? প্রহ্লাদের সামনে? কোনও কেলেঙ্কারীর কথা নয়তো?

পাঁচ মিনিট বাদে নয়ন উন্মিলিত হয় বাবার; তিনি বলেন: এখন তোর বয়েস চব্বিশ? তাহলে, লিখে রাখ, পাঁচ বছর বাদে তোর বয়েস হবে উনত্রিশ!

সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, ননীও! লিখে রাখে একটা কাগজে। যত্ন করে ভাঁজ করে। তারপর ডায়রীর মধ্যে রেখে দেয় সে। নিশ্চিন্ত হয়। ননী নিশ্চিন্ত হয় বটে; কিন্তু প্রহ্লাদ হয় না। বাবাকে সে নিরীক্ষণ করতে থাকে। বাবাই এতক্ষণ সবাইকে অবলোকন করছিলেন; বাবাকে কেউ যাচিয়ে দেখবে এই নিশ্চিন্ততায়; বাবারও বাবা যে এইখানেই এতক্ষণ ঘাপটি মেরে ছিলো কেউ, এই আবিষ্কারে চাঞ্চল্য দেখা যায়। কিন্তু প্রহ্লাদ ঠায় বাবার আপাদমস্তক চক্ষুধঃকরণ করেই চলে। অনেক, অনেকক্ষণ বাদে বাবাই প্রশ্ন করেন: কী দেখছ বাবা?

প্রহ্লাদ ঃ দেখছি তুমি আমাদের সেই পাগলা জগাই কিনা ?

নেপালী বাবা ঃ সবাই পাগল বাবা ! কে পাগল নয় এ জগতে ? কেউ রূপে পাগল ; কেউ অপরূপে—

প্রহ্লাদ ঃ না ; সে পাগল নও বাবা তুমি ; তুমি সেয়ানা পাগল—

বাবার চেলা দু'জন এতক্ষণে আক্রমণ করে : কী যা তা বলছেন আপনি ? মাথটাথা খারাপ না কি ?

প্রহ্লাদ ঃ কিছু যা তা বলছি না ; তোমাদের বাবা বেশ বুঝেছেন আমি কি বলছি ?

নে বাবা ঃ না বাবা তোমার কথা তো আমার বোধগম্য হচ্ছে না—

প্রহ্লাদ ঃ এখুনি হবে। গায়ে হাত পড়লেই হবে ! তুমি আমাদের ইস্কুলের হাবলু রায় ?

নে বাবা ঃ সে কোন্ জন ?

প্রহ্লাদ ঃ তুমি সেই জন। তোমাকে পাগলা জগাই বলে ক্ষেপাতাম ; মায়ের শাড়ী কেটে লাল পাঞ্জাবী পরে ইস্কুলে আসতে বলে। ইস্কুল থেকে এক্সপেল্ড হয়ে তুমি কোথায় পালিয়ে গিয়েছিলে—

বাবার চেলারা এবারে মার মূর্তি হয়ে ওঠে। চেলাকাঠ নিয়ে তেড়ে আসে দুই চেলা।

বাধা দেন কিন্তু স্বয়ং বাবা ; বলেন ঃ ঠিকই বলেছে এ ; না জেনেও ঠিকই বলেছে। আমি তো মর্ত্ততনুতে বারবার এসেছি এই মায়ার জগতে ; পাঁচশো বছর আগে এসেছিলাম নদীয়ায় ; তারও হাজার হাজার বছর আগে ব্রজে ; এত আমার লীলা আর এই যে আমাকে পাগলা জগাই বলে চিনেছে এত আমার সেই ব্রজের রাখাল বালক বন্ধু ! একে তোমরা মেরো না ; একে মারলে সে মার যে আমারই পিঠে এসে পড়বে।

প্রহ্লাদ ঃ রাখাল বালক বন্ধু তো বুঝলাম ! রাখালের হাতের

পাঁচন বাড়ী দেখেছ? পুলিসের রুল?—ইতিমধ্যে সেই প্রথম এবং দ্বিতীয় জন আবার ফিরে এসেছে। অতগুলো টাকা দিয়ে তাদের মন খচ্‌খচ্‌ করছিলো। তারা এবারে এসেছে দলবল নিয়ে। দশ টাকা দেওয়ার বদলে তাদের অনেকগুলো দশ টাকা গেছে পকেট থেকে। একটা মারপিট হবো হবো হয়েছে যখন, এমন সময় উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে থেকে জনা দুই ষণ্ডামার্কণ্ড গোছের লোক দাঁড়িয়ে উঠে বললো: আপনারা থানায় আসুন সব; মহাপ্রভু আর চেলা দু'জনকে নিয়ে আমরা গাড়ী করে থানায় যাচ্ছি। আমরা পুলিশের লোক; অনেকদিন ধরেই সন্দেহ ছিলো আমাদের; আজকে সন্দেহ-ভঞ্জন পালা জমবে থানায়। বিনা বাক্য-ব্যয়ে মহাপ্রভু আর দুই চেলা গাড়ীতে করে গেলো পুলিশের লোকদের সঙ্গে। কারুর গলা দিয়ে টুঁ শব্দ বেরুলো না পর্যন্ত।

থানার নাম শুনে অনেকেই আর এগুলো না। প্রহ্লাদ আর ননী শুধু থানায় গেলো শেষ পর্যন্ত! বড়বাবু তো শুনে আকাশ থেকে পড়লেন: কই কেউ তো আসে নি। তাছাড়া থানা থেকে আমরা কাউকে পাঠাইনি তো! তারা যে পুলিশের লোক বললো, তাদের আইডেন্টিটি কার্ড দেখেছেন?

ননী ও প্রহ্লাদ: না।

বড়বাবু: পুলিশ শুনেই ঘাবড়ালেন? আপনারা তো আর খুন-ডাকাতি কিছু করেন নি?

ননী ও প্রহ্লাদ: আজ্ঞে না; আমরা কখনো কিছু করি নি!

বড়বাবু: তবে?

ননী ও প্রহ্লাদ: তাহলে এখন উপায়?

বড়বাবু: উপায় আর কি? বুঝতে পারছি বেগতিক দেখে তাদের দলের লোকই বার করে নিয়ে গেছে সর্দারকে; আপনাদের চোখে ধুলো দিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে আর কি!

বেরুবার সময় বড়বাবু অবশ্য আশ্বাস দেন: এখন যান; তবে এটুকু ভরসা আপনাদের দিতে পারি; পুলিশ সব সময়েই সৎ নাগরিককে সাহায্য করতে প্রস্তুত। যদি নেপালী বাবাকে একবার ধরে আনতে পারেন থানায় কোনও রকমে; তাহলে ঠেঙ্গিয়ে বার করে দেব সব টাকা আপনাদের; সেই সঙ্গে সব কথাও!

ছয়

ননীগোপাল দে এবং প্রহ্লাদ দত্ত দু'জনের সাম্প্রতিকতম জিজ্ঞাসা : বাড়ী কোথায় ? উত্তরও দু'জনেরই যুগপৎ বেরিয়ে আসে : বাড়ী নেই।

বাড়ী যদি কোথাও থাকে তো ননী এবং প্রহ্লাদের মাথার উপরই এখন। সত্যি মাথায় দু'জনেরই বাড়ী পড়েছে সম্প্রতি। ননীর বাড়ীর সবাই বার্মায় ফিরে গেছে ; ননী এখন প্রহ্লাদের সঙ্গে প্রহ্লাদের মেসে উঠেছে। কিন্তু মেসেই বেশ ছিলো সে। যদিও প্রহ্লাদের খরচাও প্রায়ই তাকে বহন করতে হতো, তবুও 'আঃ বেশ',—বলে আবেশে মজে ছিল। কিন্তু এখন আর নেই। সারা সপ্তাহে কাজে এবং ছুটির দিনে বাড়ীর চিন্তা নিয়ে ঘোরা। এবং সেদিন অশোকার সঙ্গে দেখা করবার উপায় থাকবে না। কারণ বাড়ী না পাওয়ার খবর পাওয়ামাত্র অশোকা চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করতে থাকবে। কিন্তু সামান্য একটা বাড়ীর জন্যে এতটা বাড়াবাড়ি—আমার কাছে কেমন বিসদৃশ লাগে।

অশোকা আর ননী যখন বি-এ পাশ করলে তখন ওদের আলাপও ছিলো না। কিন্তু এম-এ দেবার কয়েক বছর পরেই সেই মেয়েই কেমন ধনুক ভাঙা পণ করে বসলো ? সে ননীকেই বিয়ে করবে। রামচন্দ্র সীতাকে পাবার জন্যে সত্যিই ধনুক ভঙ্গে রাজী হয়েছিলেন। আধুনিক সীতাকে পাবার জন্যে ধনুক পর্যন্ত গডাতে হয় না—তার জন্যে ধনবান হলেই কাজ চলে যায়। সেদিনকার রামচন্দ্র স্বর্ণসীতার পায়ের কাছে বসে আসল সীতার জন্যে বৃথাই দুঃখ জানাতেন—আধুনিক সীতার স্বর্ণের সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ। যথেষ্ট স্বর্ণ থাকলে তবেই সীতারাও থাকেন।

ননীরও যথেষ্ট অর্থ ছিলো। কিন্তু সমস্ত অর্থই এখন তার কাছে অনর্থক মনে হচ্ছে। বাড়ী না পাওয়া গেলে বিয়ে হবে কেমন কোরে? ঘর না পেলে ঘরণী থাকবে কোথায়?

কিন্তু শুধু ননী আর অশোকার নয়—ওদিকে মিলি আর প্রহ্লাদ দত্তর বিয়েও বন্ধ হয়ে আছে। এবং ওই একমাত্র কারণেই—বাড়ী নেই।

মিলির সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রহ্লাদেরও ওই একটিমাত্র বাধা—বাড়ীর বাধা।

ওদের সঙ্গে একযোগে আমরা—আমরা মানে ননী আর প্রহ্লাদের বন্ধুরাও উঠে পড়ে লাগলাম—ওই বিপুল এক বাধা অপসারণের বিপুলতর প্রচেষ্টায়।

কিন্তু বাধা দিলে বাধবে লড়াই—এত আমরা জানতাম। সত্যি লড়াই বাধার পর থেকে বাড়ীওয়ালাদের সঙ্গে ভাড়াটেদেরও এও এক লড়াই,—ভাড়ার জন্যে নয়, ভাড়া না দেওয়ার জন্যে।

কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে (এবং সেই সঙ্গে আমরাও) সেই সময় আরেক প্রস্তাবে আমরা বিহ্বল হয়ে পড়লাম। কিন্তু তার আগে ওরা কেমন করে প্রেমে পড়লো আগে আপনাদের কাছে সেইটেই পরিষ্কার করা দরকার।

সত্যি কথা বোলতে কি অশোকাকে যে ননী কেমন করে বাগালো এ আমাদের এক বিস্ময়। এবং সেই সঙ্গে মিলিকে প্রহ্লাদের তুলে আনাতেও বাহাদুরী যতটা আছে, আমাদের কাছে ব্যাপারটা সেই পরিমাণে অভাবিতও বটে।

সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কেমন গোলমাল ঠেকে। অশোকাকে বিয়ে করতে চাইছে ননী, কিন্তু তাকে ভালোবাসে আসলে প্রহ্লাদ। আবার প্রহ্লাদকে মিলি বিয়ে করতে চাইলে হবে কি, মিলিকে পাবার আন্তরিক বাসনা একমাত্র লোকেনের। এদিকে লোকেনের প্রেমে পড়েছে সুলেখা। ননী অশোকাকে বিয়ে করতে চাইলেও

তার নজর ছিলো নাকি লতিকার ওপর—সে বিয়ে করেছে এই সেদিন মনোময়কে এবং বিয়ের আগে অনেক দিন প্রেম করেছে শ্রীমন্তর সঙ্গে। এতদূর পর্যন্তও আমার মাথা ঠিক থাকে, কিন্তু গোলমাল বাধে জ্যোতির্ময় এলেই। এর মধ্যে জ্যোতির্ময় আসে কোথা থেকে? এঁ্যা। এইখানেই আমার কেমন যেন মনে হয় যেন অকালে যতি এসে পড়ার ফলেই একটি আশ্চর্য সুন্দর কবিতা মাঠে মারা গেছে। কিন্তু জ্যোতির্ময়কেই না কি অশোকার আসলে ভালো লাগতো এতকাল।

কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে শেষ পর্যন্ত কি পাকে চক্রে কে জানে অশোকার সঙ্গেই ননীর বিয়ে হচ্ছে। অথচ এই সেদিন পর্যন্ত অশোকা ননী সম্বন্ধে কী না বলতে বাকী রেখেছে এবং তার উত্তরে,—প্রত্যুত্তরে ননীর জবাবগুলোও মনে রাখবার মতো। আর মিলিও কম যায় না—লোকেনকেও কত ছলে কত রকম ভাবে তাতিয়ে সেই ছলনাতেই শেষ।

এই সমস্ত কথা ভেবে ভেবে ভাবনার কূল যখন মিলছে না, তখনই —ননী আর প্রহ্লাদের এই নয়া প্রস্তাব—

ননী আর প্রহ্লাদ যে সহজে ছাড়বে না—আমরা জানতাম। কিন্তু এতদূর এগুবে এ ছিলো অকল্পিত। বাড়ী খোঁজার পর্ব শেষ করে দেখা গেলো মাত্র দুটি লোক দু'খানা বাড়ী দিতে পারে। কিন্তু সে দু'জনের কাছে এগুবার উপায় নেই। ননী ও প্রহ্লাদ এখন গেলে বাড়ী ধার দেওয়া তো দূরের কথা, বাড়ী থেকে দূর করে দেবে। তবু শেষ পর্যন্ত ননী ও প্রহ্লাদ জ্যোতির্ময় আর লোকেনকেই ধরলে তাদের বাড়ী দু'টো ছেড়ে দেওয়ার জন্যে।

লোকেন তখন এক্সিডেন্টে ধরাশায়ী। কিন্তু এও তার জীবনে আরেক এক্সিডেন্ট—এবং তার ফলে মনে হচ্ছে সে যেন ধরায় আর নেই। ধরা থেকে স্বর্গে জেগে উঠে সে দেখলে মিলি তার বিছানার পাশে।

মিলিকে একেবারে সঙ্গে নিয়ে এসে প্রহ্লাদ কথাটা পাড়লে।

এত দিনের জমানো অভিমান, এত রাগ সব কখন গলে আবার অনুরাগ হয়ে দেখা দেয়। মিলিকে না পাক—মিলির বিয়ে হবে তার বাড়ী থেকে—এর চেয়ে আর বড়ো পাওয়া কী হবে।

ওদিকে জ্যোতির্ময়কে রাজী করাতেও অশোকার বেশী দেরী হল না। জ্যোর্তির্ময় শুধু বললেঃ (একটু কাব্যি করে বল্লে), "তুমি যখন বাড়ী বয়ে এসেছ—তখন এ বাড়ী তো তোমারই।"

জ্যোতির্ময় আর লোকেনের এই ব্যাপারে মর্মাহত হয়েছি আমরা। সত্যি কথা বলতে ওদের আন্তরিক প্রেমের উত্তরে অশোকা আর মিলির নিছক ছলনা আমাদের ভালো লাগে নি। আমার তো একটুও না। কিন্তু মিলিকে দেখবামাত্র গলে যাওয়ার মতো লোক অন্ততঃ লোকেন আমি কোন দিন ভাবিনি।

আর এর ওপর ননী এবং প্রহ্লাদের সহাস্য বদনে ঘুরে বেড়ানোয় আমরা ঠিক কোরেছিলাম, আমরা জ্যোতির্ময় এবং লোকেনের বাড়ীতে যাচ্ছি না। শুধু তাই নয়, আমরা যারা শেষ পর্যন্ত এমন কটাক্ষও করেছিলাম যে, ননী আর অশোকার বিয়ে ফেঁসে যাবে—তাদেরই কাছে সমস্ত ব্যাপারটা অসহ্য ঠেকছে। এবং এরই মধ্যে জ্যোতির্ময় আর লোকেনকে দিয়ে অশোকা আর মিলি যা-খুসী-নয়-তাই করিয়ে নিচ্ছে। বাড়ীর কলি ফেরানো থেকে—ঘরের আসবাব পত্তর কোথায় কোনটা বসালে কেমন মানাবে—সব বন্দোবস্তই জ্যোতির্ময় আর লোকেন অম্লান বদনে কোরে যাচ্ছে।

আমরা কিছু বলতে গেলেই এক জবাব। 'কী করব ভাই, মিলি বল্লে,'—'অশোকা এসে চাইলে...' যুগপৎ এই ধ্বনি আমাদের কর্ণ পীড়ার কারণ হয়।

আমরা ওদের সঙ্গে বাক্যালাপ খতম করেছি। এবং সেই সঙ্গে ঠিক হয়েছে এ-বিয়েতে আমরা যাচ্ছি না।

শেষ পর্যন্ত সেই বিয়েই হচ্ছে। এবং যেতেও বোধ হয় আমাদের হবে। (আসছে ১৭ই আষাঢ় ওদের বিয়ে। ওদের মানে—অশোকার সঙ্গে জ্যোতির্ময়ের এবং মিলির সঙ্গে লোকেনের।)

'বাড়ীতে যখন আনছি তখন চিরদিনের মতই তোমাকে কেনো আনবো না।'

এই অকাট্য যুক্তি অস্বীকার করতে পারে নি মিলি, অশোকা; কেউই না। এবং সেই সঙ্গে আরো এক যুক্তি আবিষ্কার করেছে নিজেরাই। সত্যিই তো বাড়ীই যদি পেলাম তো জ্যোতির্ময় আর লোকেনের আপত্তি কি থাকতে পারে। আপত্তির কোনো কারণ খুঁজে পায় না তারা—অশোকা আর মিলি। তবে ননী আর প্রহ্লাদকে একবারে বঞ্চিত করা ভালো মনে হয় নি—"তোমাদের কিন্তু রাগ করে দূরে থাকলে চলবে না। হ্যাঁ, তা বলে দিচ্ছি কিন্তু। সব কেনা-কাটা —সব কিছুর ভার তোমাদের ওপর।"

ননী আর প্রহ্লাদের হাত ধরে অশোকা আর মিলির এই করুণ উক্তি আমাদের কাণেও আসে।

এবং বলা বাহুল্য, আমরাও এখন থেকেই প্রস্তুত হতে থাকি। ননী আর প্রহ্লাদের সঙ্গে আমরা খেটে ওদের ভার যথাসম্ভব লাঘব করবার চেষ্টায় থাকি অতঃপর।

সাত

বাঘের মুখে মানুষ পড়লে কী পরিস্থিতি হয় এবং বেঁচে ফিরে এলে, সেই পরিস্থিতির ওপর রং চড়িয়ে, ছাপার অক্ষরে তাকে পরিবেশন করলে যে রোমহর্ষক শিকার কাহিনী রচিত হয়ে থাকে তা পড়ে পড়ে যখন অরুচি ধরে গেছে ঠিক সেই সময়েই আমার এই নতুন অভিজ্ঞতা : মানুষের মুখে বাঘ পড়লে কেমন হয় !

ননীগোপাল ; আমার বন্ধু ননীগোপাল দে, ডবল বি, এ, পরাক্রমে, দুঃসাহসিকতায় সত্যি সত্যিই বাঘের চেয়ে কম নয়। বাঘের সবগুলি গুণ ছাড়াও তার মধ্যে আরও যা প্রকট তা বাঘের নেই। সে হল তার যে-কোন অবস্থায় পড়ে শুধু কথা বলে তার থেকে বেরিয়ে আসা। বাঘের ডাকের চেয়ে ননীর কথা কোন অংশে কম নয়। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর মত ননীর কথা যার একবার কানে গেছে, সেই মজেছে। আপনি বালক হন, নাবালক হন, সাবালক হন, স্ত্রীলোক হন, ননী আপনার পক্ষে সমান ভয়াবহ।

আমার কনিষ্ঠ তনয় ডাকাত, ক্ষেপলে মা'রও নয়, বাবা'রও নয়। তখন তার কান্না থামায় এমন যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য কেউ আমার জানা নেই। সেই ডাকাত একবার একটু চুপ করে গেছে যদি সেই মুহূর্তে ননীকে দেখা গেছে দুয়ার হতে অদূরে। এবং সেই মুহূর্তের বিরতিকে কাজে লাগিয়েছে ননী। এটম বমের পলতেয় আগুন লাগতে যেটুকু সময় লাগে সেটুকু সময়ও নষ্ট করেনি ননী।

ডাকাত, চিড়িয়াখানায় গেছ ?

হ্যাঁ, কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দেয় ডাকাত।

উজবুক দেখেছ ?

না।

তাহলে চিড়িয়াখানায় যাও নি।

হ্যাঁ, গেছি।

চিড়িয়াখানায় সবাই তো উজবুক দেখতেই যায়—তুমি কেন দেখ নি?

বাবা দেখায় নি।

উজবুক দেখবে?

হ্যাঁ।

তারপর আমি যেই একটু পেছন ফিরেছি, অমনি ননী আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলেছেঃ ঐ দেখ উজবুক! আর তারপর সারাদিন ডাকাতের চোখ মেয়েদের হৃদয়ের মত শুকনো। কান্না নেই একবারও। শুধু চীৎকার সারাদিন। বাবা উজবুক! বাবা উজবুক!! বাবা উজবুক!!!

ননীগোপাল তার কীর্তির চেয়ে সত্যিই মহৎ। তার অনন্ত-কীর্তির মহিমান্বিত জীবনের আরও দু'এক টুকরো এখানে তুলে দিলে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না কিন্তু পাঠকের ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে কী না সে কথা পাঠক-পাঠিকারাই বলতে পারেন।

মনে আছে শিকারের গল্প হচ্ছিল। হাজারীবাগের রাস্তায় ঠিক সন্ধ্যেয় যে ডাকবাংলোতে উঠেছিলাম তা ছেড়ে দিতে হল। সাময়িক উদ্বাস্তু আমার প্রতি সহানুভূতির অভাব হল না, কিন্তু অভাব হল জায়গার। সন্ধ্যেয় বাঘের ভয়, বার বার সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন তারা যারা সত্যি সত্যি শুভানুধ্যায়ী। না হলে অত সাবধানবাণীর পরেও আমাকে তাদের ওখানে থাকতে বললেন না কেন।

যাই হ'ক মাঝ রাস্তা বরাবর এসেছি জীপে। ঢুলছিলাম। উঠে বসলাম। ড্রাইভার ফিস্ ফিস্ করে বলছেঃ 'শের'।

রাস্তা জুড়ে শুয়ে আছেন মহাপ্রভু। অমনপরিস্থিতিতে বন-

বেড়ালকেও আমার রয়েল বেঙ্গল বলে ভুল হয়, আর এত বাঘ। সঙ্গে বন্দুক নেই। ছুঁড়তে জানি না যে সে কথা অবশ্য মনে এলো না; শুধু বন্দুক নেই এটাই আরও ভয় পাইয়ে দিলে। আলো ফেলা সত্ত্বেও বাঘ নির্বিকার। লাফ দিলেই গাড়ী শুদ্ধু পাশের খাদে। গাড়ীতে বসে রেগুলার কাঁপছি।

এই পর্যন্ত শুনে ননীর অযাচিত মন্তব্য : অত নার্ভাস হবার কী ছিল ? না, না, ওরকম ভয় পাওয়া উচিত হয় নি।

রাগে গা জ্বলে যাচ্ছিলো। বললাম :

দেখো ননী, সব জিনিষের একটা সীমা আছে। ঘরের মধ্যে বসে, পা দোলাতে দোলাতে, চা খেতে খেতে অমন অভয়দান সবাই ক'রে থাকে। পড়তে যদি—

আহা হা, রাগ কর যদি বলব না।

রাগ না করে দাঁত চেপে বলি! তুমি কি করতে শুনি?

আমি কেন? তুমিও পারতে। এই দেখ, বলে ননী নিজের দুটো আঙ্গুল বার করে দেখায়, এই দুটো আঙ্গুল সোজা করে রাখবে! বাঘ যেই লাফাবে, তুমি না নড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। ঘাড়ে পড়বার আগেই আঙ্গুল দুটো বাঘের চোখে ঢুকিয়ে দেবে সোজা—ব্যস দেখতে না পেয়ে বাঘই হ'ক আর ইস্কুলের হেডমাস্টারমশাই-ই হ'ন—

কথাটা বলে গেলো ননী, এমন ভাবে, বিশ্বাস করুন, যেন চা কি ভাবে তৈরী করতে হবে সে-বিষয়ে টি এক্সপ্যানসন বোর্ডের নির্দেশ-নামা। যেন কিছুই নয়। যেন জলবৎ।

তবুও গায়ে না মেখে, মেজাজ না খারাপ করে এগোতে থাকি। হ্যাঁ, গাড়ীতে বসে কাঁপছি আর ভাবছি বাঘ না বাঘিনী। বাঘিনী হলে আরো মারাত্মক। ক্যাপার সিজনে ওদের মুখে পড়লে নাকি কম্যুনিষ্টদেরও নিস্তার নেই।

কেন? ননী আমায় বাধা দিলে আবার : সে-বোঝা আবার শক্ত কী?

কী রকম? এবার আমার গলায় হেস্তনেস্ত করার সুর।

কেন? যেই লাফাবে দেখবে গরুর মত বাঁট ঝুলছে কী না—

এরপর কী হ'ল সে-প্রসঙ্গ আমার পক্ষে উত্থাপন করা অসম্ভব।

এমনি অসংখ্য, অজস্রবার ননী আমার মনে দাগা দিয়েছে। অমন যে আমার জ্যাঠামশাই, যিনি সুস্থ স্বাস্থ্যে, বহাল তবিয়তে, আরো দশ বছর অন্তত টিকতেন, তাঁর জীবনেও অকাল দশমীর বাজনা বাজালে যে সেও ওই ননী। তারই একটি কথায় তিনি একদিন অসময়ে তোপ দাগলেন। 'একটা' দূরের কথা তখন ভালো করে তাঁর জীবনের বারোটাই বাজে নি, অথচ ইহলীলা সম্বরণ করতে হ'ল তাঁকে। সামান্য অসুখ করেছিলো ভদ্রলোকের, ভালো হয়ে উঠছিলেনও তা থেকে। ননীকে আমার জ্যাঠার অসুখের কথা বলাই ভুল হয়েছিল।

ননীর বাড়ী গেছি একদিন; সে সময়ে ননী নেই। ননীর বাবা বেরিয়ে এসে বললেন: 'ননী তো তোমার ওখানে যাবে বলে বেরিয়েছে, যায় নি?'

'না'; আমি জবাব দিলাম: 'আমার বাড়ীতে যাবার তো কথা ছিলো না।'

'সে কী?'

আবার তার বাবার মুখে শুনি: 'সে কী? ননী বেরুবার সময়ে বলে বেরুল যে, তোমার জ্যাঠামশায়ের না কার যেন আজ মারা যাবার কথা আছে।'

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, আমি থামিয়ে ফের জিজ্ঞেস করলাম, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না, তাই জিজ্ঞেস করতেই হ'ল: 'কী বললেন? ননী কী বলেছে,—আমার জ্যাঠামশায়ের কী কথা ছিলো আজ?'

ননীর বাবার উত্তর একই: 'ননী বলে গেছে, যে তোমার জ্যাঠামশায়ের নাকি আজ মারা যাবার কথা আছে, তাই তোমার কাছে সে যাবে কেমন আছেন তিনি তাই জানতে।'

একটু ক্ষেপে গিয়েই ননীর অভাবে ননীর বাবাকেই আক্রোশটা জানাই : 'আচ্ছা, আপনিই বলুন, কারুর মারা যাবার আবার কথা থাকে নাকি ; লোকে তো এমনই মারা যায়, কথা না থাকলেও—।'

ননীর বাবাও ক্ষুব্ধ হন ; 'আমিও তো ননীকে বললুম, 'সে আবার কী ? মারা যাবার আবার কারুর কথা থাকে না কি ?' তাতে ননী বললে যে, না, তুমিই নাকি তাকে বলেছো যে জ্যাঠামশায়ের বাঁচার কোনো আশা নেই ; মারা যাবেনই ; ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে। আজকালের মধ্যেই নাকি মরবার কথা।'

সেই মারাত্মক কথা হয়তো জ্যাঠামশায়ের কানেও গেলো ! তিনি বাড়াবাড়ীই করলেন একটু। সেই রাতেই মারা গেলেন। কথা রাখলেন ননীর !

এরপর থেকে পথ খুঁজছিলাম ননীকে দাবাবার। আমাকে পথ বার করতে হ'ল না ; ভগবানই আমার সহায় হলেন। তবে অতটা না করলেও পারতেন। ভগবান একটু বেশি দূর গেলেন। যার ফলে ননী এখন হাসপাতালে। সত্যি বলছি এতটা আমি ভাবিনি। ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বলি তাহলে। আগাগোড়া যেমন ঘটেছে, তেমনি।

ননীর সঙ্গে দেখা হ'ল আমাদের পাড়ারই চূড়ো মল্লিকের সঙ্গে। চূড়ান্ত দেখা। গ্রীকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল গ্রীকের। শেয়ানের সঙ্গে কোলাকুলি শেয়ানের।

ননী কী কথা বলে ? কটা কথা বলে ? যতই বলুক, দম নেবার জন্যে তো অন্তত থামতে হয় তাকে। কিন্তু চূড়ো মল্লিক দমও নেয় না ; দমকলের মত কোন কিছুতেই সে থামা বলে জিনিষ জানে না। বেদম কথা বলে যায় চূড়ো ননীর সঙ্গে প্রথম দর্শনেই :

তাই বলুন ক্ষেপাদার ছেলে আপনি ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব চিনি আপনাদের পরিবারকে, ঈশ্বরদীর দে'দের

চিনব না? ওখানে যে আমার ছোট শ্যালীর বিয়ে দিয়েছি; ক্ষেপুদা খুব লোক ভালো, তুমিও বাবা হবে না কেন, তুমি তো ভালো হবেই, তোমার ঠাকুরদা অতি সজ্জন লোক ছিলেন। আমার কথা আর কী বলব? রিট্যায়ার করেছি। পেনসনের টাকা কটা পাই; বাবা বাড়ী দিয়ে গেছলেন; তার ভাড়া পাই, চলে যায় কোনো রকমে। এই দেখ না দুটো মেয়ের বিয়ে দিলাম। অবশ্য ছেলেটা এখন কিছু আনছে। আমার আর বুড়ো বয়সে খরচাই বা কী? আমি ঐ সখের মধ্যে একটু সিনেমা-থিয়েটার দেখি। গান বাজনার খেয়ালও আছে। আমার মাতুল বংশ তো জানই, তোমার কাছে আর কী বলব বাবা, মায়ের কাছে মাসীর গল্প, জানই তো বিখ্যাত দিলু্ রায় আমার নিজের পিসতুতো ভাই। থিয়েটারও করতাম এককালে। দানীবাবুর সঙ্গে একদিন, দাঁড়াও দাঁড়াও মজার গল্প বলি একটা তাহলে তোমায়—'

ননী দাঁড়িয়েই ছিলো এতক্ষণ, এবার বসে পড়ল।

সেই শুরু, কিন্তু সারা নয়। এরপর ননী যেখানে যায় সেখানেই চূড়ো। বাজারে যাচ্ছে ননী, চূড়ো দেখতে পেয়ে বারান্দা থেকে নেমে এল রাস্তায়। ধরাচূড়ো নেই, চূড়োর তাতে কি এসে যায়। বেলা আটটায় ধরলে, দুটোর সময় ছেড়ে দিলে, এই বলে যে, চারটের সময়ে ননীর বাড়ীতে চূড়ো আবার আসছে।

ননী ভয় পেতে আরম্ভ করল। সকাল সন্ধ্যে বাড়ীর বাইরে। নিজের বাড়ীতে রইল চোর হয়ে। কখন চূড়ো আসে কখন চূড়ো আসে। রাস্তায় বেরুলে এদিক ওদিক তাকিয়ে স্যুট করে উঠে বসে বাসে। চূড়োর বাড়ীর ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় না।

তবুও। বিধাতার মনে যা ছিল তা একদিন হলই। ননীর মুখেই মানুষেরা পড়ত এতকাল; এবার মানুষের মুখে পড়ল ননী। ৺পূজার কদিন আগেই বলি হল ননী। পাঁঠা বলি নয়, নরবলি নয়, ননী বলি হ'ল সেবারের ৺পূজোয়।

রিক্স করে ফিরে, পয়সা মিটিয়ে, বাড়ীর গলির মধ্যে ঢুকবে বলে, পা

বাড়িয়েছে ননী। এমন সময় চূড়ো। তখনও সূর্য ভালো করে ওঠে নি। তারপর সূর্য ভালো করে উঠল। চড়চড় করে উঠল এক সময়ে। ঢলে পড়বার সময়ও হয়ে এলো এরপর। তখনও চূড়ো বলছেঃ একটা মজার গল্প বলি শোন, ননী।'

কিন্তু ননী আর পারল না। মাথা ঘুরছে; পা টলছে। একটু দূরে একটা মোটর গাড়ী দেখেও দেখল না, ছুটে পালাতে গেল, ব্রেক কষেও মোটর গাড়ীর চলা বন্ধ করা অসম্ভব হ'ল। ননীর গায়ে এসে থামল।

হৈ-হৈ। হুলুস্থুল। ননীকে সেই গাড়ীতে করেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তেও ননীর মনে কোন খেদ নাই। যাক্। ক'দিনের জন্যে তবু চূড়োর হাত থেকে রক্ষা।

বাহাত্তর ঘণ্টা বাদে তবে হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে এলো ননীর। জ্ঞান ফিরে আসবার পর প্রথমেই মনে হ'লঃ চূড়োর কথা। যাক্, চূড়ো নেই। আ! বলে একটা আরামের নিঃশ্বাস নিলো ননী।

এমন সময় দুটো তিনটে বেড ওদিক থেকে কার গলা শুনলো ননী। এই যে জ্ঞান হয়েছে, যাক্।

ঘরে বাজ পড়ল। কার গলা? উঠে দেখতে গেল ননী। 'আহাহা, উঠো না, উঠো না; আমি চূড়ো। তোমার সঙ্গেই এখানে একটা বেড নিয়ে রয়ে গেলাম। আমার একটা টিউমার অপারেশনের কথা অনেক দিন ধরেই ছিলো। তা হাসপাতালে থাকতে ভালো লাগে কারুর— একা-একা? তাই এতদিন করাই নি, এখন তোমাকে পেয়ে গেলাম। দেখলাম তোমাকেও বেশ কয়েকদিন একা থাকতে হবে এখানে। তাই আমিও সুবর্ণ সুযোগ ছাড়লাম না! এখন দু'জনে মিলে খুব মজার গল্প করা যাবে, কী বল বাবা?

বাহাত্তর ঘণ্টা বাদে পাঁচ মিনিটের জন্যে ননীর জ্ঞান ফিরে এসেছিল। আবার জ্ঞান হারাল সে। ডাক্তারেরা বললেঃ চোটের চেয়েও বেশি লেগেছে *shock*!

হাসপাতালে দ্বিতীয়বার জ্ঞান ফিরে আসতে যাকে দেখলো; ননীগোপাল তাকে দেখে আবার অজ্ঞান হয়ে যাবার মতো হ'ল সে। চূড়ো মল্লিকের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মল্লিকা মল্লিক। ননীর মুখ দিয়ে শুধু বেরুলো: মল্লিকা? ঘাড় ফেরালো নাম শুনে মল্লিকা; এখানে তাকে আবার ডাকে কে? মুখ ফেরাতেই ননীর চোখে অন্ধকার হয়ে এলো পৃথিবী; আবার অজ্ঞান হলো ননীগোপাল দে ডবল বি. এ.; অবিবাহিত প্রতিভাবান যুবক। মল্লিকা হচ্ছে ননীর ছেলেবেলার বন্ধু; পাশের বাড়ীর ফুট ফুটে মেয়ে। কিন্তু ভয়ানক দুষ্টু। ধবধবে ফর্সা; কোঁকড়া চুল; পাতলা ঠোঁট। ছিপ ছিপে স্মার্ট মেয়ে; ননীকে নাকাল করা, অপ্রস্তুত করা, এই ছিলো মল্লিকার কাজ। কিন্তু ধরা পড়বার ভয়ে মল্লিকা নিজে কখনও এগিয়ে আসত না। কাজগুলো করাত তার দাদা ছিটু চৌধুরীকে দিয়ে। এখনও; এই জ্ঞানহারা অবস্থাতেও ননীর নিশ্চয়ই সে সব কথা মনে পড়ছে। ছিটু আর ননী পড়ত এক স্কুলে; এক ক্লাসেই। গরমের ছুটিতে *home-task* না ক'রে ননী কাটিয়ে এসেছে মামার বাড়ীতে। ছিটুও টাস্‌ক্ করে নি। ছুটির কদিন আগে দু'জনে পরামর্শ হচ্ছে স্কুল খুললে কী করা যায়? ছিটু সান্ত্বনা দেয়; বলে: ঘাবড়াস নে; আমি যা করব ক্লাসে গিয়ে; যা বলব,—তুইও তাই করবি; তুইও তাই বলবি। বুঝলি? 'বুঝলি' নয়; ছিটু বুঝলি উচ্চারণ করতে পারত না; ছিটু বলতো: বুধ্‌লি? অগত্যা ননী তাই 'বুধ্‌লো'। মল্লিকা তার দাদার সঙ্গে আরোও ভালো করে 'বোধালে' অবশ্য; বলল: খবরদার নিজের বুদ্ধি খাটাতে যেও না আবার! তুমি যা বোকা—!

স্কুল খুললো: ক্লাস আরম্ভ হ'ল। হোমটাস্‌কের খাতা একের পর এক দেখা চললো। ছিটুর ডাক এলো যথা অসময়ে; হোমটাস্‌ক হয় নি কেন? থ্যার্ডমাস্টারের ডাক নয়; গর্জন। আজ্ঞে, মিঁউমিঁউ করে বললো ছিটু: ম্যালেরিয়া হয়েছিলো! ছিটুর আপাদমস্তক এক্সরে করে সন্তুষ্ট হন থার্ডমাস্টার। হ্যাঁ; হতে পারে। ছিটু তৈরী হয়েই

এসেছিলো। তার রোগাপটকা চেহারার ওপর চুল ছোট ছোট ক'রে ছেঁটে; কণ্ঠার হাড় বার ক'রে; গলার স্বর ক্ষীণ ক'রে এমন একটা করুণ অবস্থার সৃষ্টি করল ছিটু যে, থার্ডমাস্টারের মুখ দিয়ে পর্যন্ত বেরুলো : আহা!

ছিটুর পরেই ননীর টার্ণ; ননীকে জিজ্ঞেস করা মাত্রই ননীর হেঁড়ে বাজখাঁই গলায় প্রত্যুত্তর : আজ্ঞে! ম্যালেরিয়া হয়েছিলো—! বলা মাত্রই ক্লাস সুদ্ধ ছেলের থ্যার্ডমাস্টারকে উপেক্ষা করে অট্টহাস্যে ফেটে পড়া। ননী বুঝতেই পারে না তার বেলায় হাসির কারণ কি? থার্ডমাস্টার ডাকলো : এদিকে এসো। ননী যায়; যেতেই হয় তাকে। তোমরা সবাই দেখো একবার,—থার্ডমাস্টার পরিবেশন করেন ননীকে : ম্যালেরিয়া হলে কেমন টম্যাটোর মতো ফুলে ওঠে গাল; রং ফেটে পড়ে কেমন? ওজন কত বাড়ে—দেখো তোমরা সবাই—! থার্ডমাস্টার বলেন আর গাঁট্টা মারেন; সাতটা কি আটটা গাঁট্টায় ননীর সারা মাথা লিচুর মত ফুলে উঠলো সাত আট জায়গায়। ননী কাঁদতে কাঁদতে দেখলো সব ছেলেদের সঙ্গে হাসির ঐকতানে ছিটুও যোগ দিয়েছে; ননী জীবনে আর ছিটুর সঙ্গে কথা না বলবার প্রতিজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ হ'ল।

সেবার ছিটুর মাকে শেষ পর্যন্ত ছিটুর সঙ্গে ননীর ঝগড়া মিটোতে হয়। ননী কিছুতেই বোঝে না; বলে : ছিটুই তো বললো যে, আমি যা বলব, যা করব, তুইও তাই বলবি, তাই করবি। বলে নি ছিটু? ও বলুক যে ও বলে নি?

ছিটু বললো : আমি ম্যালেরিয়া হয়েছে বললাম বলে তোকেও বলতে হবে? আর বাঘে খেতে পারে না এমন চেহারা তোর,—ম্যালেরিয়া হয়েছে বললে কেউ কখনও বিশ্বাস করে?

কাঁদতে কাঁদতে ননী বললোঃ তোরও তো সত্যি সত্যি ম্যালেরিয়া হয় নি; তোর বেলায় বিশ্বাস করলো কেন?

ছিটু ঃ আরে আমার চেহারা দেখে বিশ্বাস হয় তবু যে ম্যালেরিয়া হওয়া সম্ভব; তুই ম্যালেরিয়া না বলে অন্য অসুখ হয়েছে বললি না কেন? যে অসুখ তোকে মানায়—!

ননী চোখের জল জামার হাতায় মুছে ফেলে এবারে জানায়! তুই বলে দিবি তো আমার কি অসুখ মানায়?

তোর?—ছিটু ভেবে চিন্তে বলে ঃ তোর আর কি অসুখ হতে পারে? তোর এই গজ কচ্ছপের মতো চেহারায়?—ফুলো ফুলো তুলোর বস্তা তো তুই! বললে পারতিস যে তোর মুখে মাম্‌স হয়েছে; আর বাকী শরীরে বেরিবেরি!

ননী আপত্তি করে ঃ না; না—যাঃ! একই লোকের কখনও মুখে একরকম আর বাকী শরীরে অন্য অসুখ হতে পারে?

কেন হবে না? বাঃ!—ছিটু ডাক্তারের মত বোঝায় ঃ মানুষের শরীর একটা কিন্তু অসুখ অনন্ত! কত লোক তো একটা শরীরেই রোগের ডিপো হয়! হয় না মা? তা ছাড়া মুখে বেরিবেরি আর শরীরে মাম্‌স তো আর হয় না কারুর; হয়? তুই বল্! হয় কারুর?

ননী বলে ঃ না; তুই ঠিকই বলেছিস, তা হয় না! ছিটু—তবে? ছিটুর মা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সরে যান! আর খ্যাক্ খ্যাক্ করে খেঁকশেয়ালের মতো হাসতে থাকে মল্লিকা। ননী গুম্ মেরে যায় ফের—!

সেই মল্লিকা দেখতে দেখতে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরলো; গুটি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল প্রজাপতি।

কিন্তু প্রজাপতি হবার অল্পদিনের মধ্যেই পতিগৃহে যাত্রা করলো মল্লিকা; ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে ভ্যাবলা দেবদাসের মতো দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখল ননীগোপাল; তখন তার বয়স পনেরো; কাযেই দুঃখিতও হ'ল না সে। মল্লিকা আর ননীগোপাল দু'জনেই সমবয়সী। সেই

কারণে পঞ্চদশী মল্লিকাও পতিগৃহে যাবার সময় কাঁদলো বটে, কিন্তু সে যেমন সব মেয়েই স্বামীর ঘরে যাবার সময় কাঁদে অথচ যেতে পারলেই বাঁচে ; সেই রকম আর কি ! তবে ঘুণাক্ষরেও ননীর কথা তার মনে হয় নি ; ননীকে কোনো দিনই আমল দেয় নি সে ; ননীর সঙ্গে তার বিয়ে হবার কোনো প্রশ্নই কোনোও দিন ওঠে নি ; না ননীর বাড়ীর দিক থেকে ; না মল্লিকার। মল্লিকার বিয়েতে ননী সাঙ্ঘাতিক খাওয়া খেলো। তারপর এত বচ্ছর মল্লিকার কথা কখনোও মনেও হয় নি ননীগোপালের।

আজ হাসপাতালে মল্লিকাকে এত বছর বাদে ফুটতে দেখে 'রবিঠাকুর' মনে এল ননীর ; আমার মল্লিকা বনে তখন প্রথম ধরেছে কলি। মল্লিকা দেখতে এত সুন্দর হয়েছে কে জানত ! মল্লিকাকে কাছে ডেকে ননী জিজ্ঞেস করল ঃ চূড়ো মল্লিকের সঙ্গে তোমার কী ব্যাপার ?

আমার শ্বশুরমশায়ের বন্ধু,—মল্লিকা জবাব দেয়।

তা ওঁকে দেখতে তোমার শ্বশুর মশাই না এসে তুমি এলে কেন ?

মল্লিকা কি যেন ভাবলো একটু ; তারপর বললো ঃ ব্যাপার কি জানো ? উনি লোক খুব ভালো ; তাই কথা কইতে খুব ভালোবাসেন লোকের সঙ্গে ; শ্বশুরমশায়ের হাতে এখন অনেক কাজ ; তাইতে উনি এলেন না ; এসে যদি এবেলা ফিরতে না পারেন তাই—।

ননী বললো ঃ হাসপাতালে তো দেখা করবার সময় বাঁধা ; শ্বশুরমশায়ের এখানে এলে তো ভয় ছিলো না ?

মল্লিকা হেসে ফেলল ঃ কি হয়েছে জানো ? এর আগে একবার হাসপাতালে চূড়োবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসে শ্বশুরমশায়কে হাসপাতালেই থেকে যেতে হয় ; চূড়োবাবুর কথা শেষ হয় না ; অথচ সময় শেষ হয়ে যায় ! আমার শ্বশুরমশায় আবার ভয়ানক ভদ্র তো ; বলতেও পারেন না কিছু ! ফলে চূড়োবাবুর পাশের একটা পেয়িং বেডে

তিনদিন থেকে গেলেন সেবারে!" চূড়োবাবুকে অপারেশন টেবিলে নিয়ে গেলে তবে উনি বাড়ী আসতে পারলেন—মল্লিকা হাসে; ননীগোপাল হাসতেও পারে না। হাসলে এখনও তার কোমরে ভীষণ লাগে।

মল্লিকার গন্ধে আমোদিত হাসপাতাল। ননীর কাছে পাতালের বদলে স্বর্গ হয়ে দেখা দিলো। কিন্তু স্বর্গে লাভ কি? মল্লিকার বিয়ে হয়ে গেছে বারো বছর; ছেলে মেয়ে হয়ে গেছে তিনটে। স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে এখন ননীর কাছে মল্লিকা কেবল বিসর্গের ছুটি শূন্যি মাত্র। অথচ মল্লিকা দেখতে আরও সুন্দর হয়েছে, আরও ফুটেছে বেশি। কাচ্চা-বাচ্চা হয়ে গেলে অনেক মেয়ে যেমন এত মিইয়ে পড়ে যে তাকে আর মেয়ে বলে মনে হয় না; মনে হয় কোনও মহিলা এম্-এ! মল্লিকার তেমন হয় নি। একটি পাঁপড়ি খসে নি; রূপ সৌরভ সবই অটুট আছে। মল্লিকাকে ননী একদিন জিজ্ঞেসও করেছিলো সেকথা; তোমার চেহারা এত চমৎকার রইল কি করে মালি?

মল্লিকা বলল: আমার দিদির কথা তোমার মনে আছে? সে তো আমার চেয়ে কত বড়! তার চেহারা এখনও আমার চেয়ে অনেক ভালো আছে; তাকে দেখলে তুমি আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। আমাদের বংশের ধারাই এই!

মল্লিকা যত তার বংশের ধারাপাত শোনায়; ননীর চোখ ততই অশ্রু ধারাপাত পড়ে। কেবলই তার মনে হয় মল্লিকার সঙ্গে বিয়ে হলেই বেশ হ'ত তার। বেশ হ'ত ভাবে; আর আবেশে ছুটি চোখ বুঁজে আসে ননীর।

ননী হাসপাতালেই একদিন বলে ফেলে মল্লিকাকে: তোমার সঙ্গে বিয়ে হওয়া উচিত ছিলো আমার; ছিলো না?

মল্লিকা: বিয়ের আগে লোকে আই-এ পাশ করে; বিয়ের প্রস্তাবই করবার বয়স হয় নি তো তখন যখন আমার বিয়ে হয়ে যায়; তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'ত কেমন করে?

এসব কথা ননীর ভালো লাগে না। সবচেয়ে খারাপ লাগে

ননীর মল্লিকার খুব সুখে ঘর করার ভানে। ননী জানে মল্লিক মোটেই তার স্বামীর ঘর করে সুখী নয় ; মল্লিকা নিশ্চয়ই এখনও ননীর কথা মনে করেই হাপিত্যেশ করে। কিন্তু ননী জানে সব মেয়েই সমান ; ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না। বরং যে পতির কেলেঙ্কারী যত রাষ্ট্রে বেশি, সেই পতিকে রাষ্ট্রপতিজ্ঞানে মেয়েরা তত মনে মনে পূজা করে! শুধু তাই হলেও ছিলো একরকম ; ননীগোপাল একদিন মল্লিকাকে প্রস্তাব করলো : দেখ আমাদের দু'জনের যখন এখন আর মিলবার আশা নেই, তখন আর বেঁচে থেকে লাভ নেই ; তার চেয়ে এস জোড়ে আত্মহত্যা করে পৃথিবীতে একটা দৃষ্টান্ত রেখে যাই যে, বিবাহের চেয়ে ভালোবাসা বড়!

মল্লিকা বললো : তা কি হয় ? আমার ছেলেমেয়ে, ঘরসংসার আছে ; আমি আত্মহত্যা করলে মহাপাপ হবে ; তুমি আত্মহত্যা করতে পার ; তোমার বউ নেই। তা ছাড়া পৃথিবীতে মমতাজরা মরে বারবার সাজাহানদের তাজমহল গড়বার সুবিধা করে দিয়েছে ; তুমি আত্মহত্যা ক'রে আমাকে একটা সুযোগ দাও তোমার জন্যে কিছু করবার ; আমি কথা দিচ্ছি তুমি যদি আত্মহত্যা ক'রে মারা যাওয়াটা ম্যানেজ করতে পার তাহলে আমি তোমার স্মৃতির জন্য : ননীগোপাল দে দাতব্য পশু চিকিৎসালয় গড়ে দেবো নিশ্চয়ই!

ননী রাগ করে : মানুষের নামে পশু চিকিৎসালয় কেন ?

মল্লিকা : বল কি ? কেন ? হায় রে! ব্যর্থ প্রেমিকরা তো অবলা পশুরই মতন ; সময়ে প্রস্তাব না করে ব্যা-ব্যা করে ; হাম্বা! হাম্বা! ডাকে ; ডাকে না ?

অতঃপর ননী বোঝে ; বোঝে যে মল্লিকা জোড়ে আবার বিয়ে করতে পারে ; কিন্তু জোড়ে আত্মহত্যা করবার পাত্রী নয় সে! তাই ননীই একদিন ভোরবেলায় হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়ে ; বেরিয়ে পড়ে বাড়ী যায় না সে। ঢাকুরিয়া স্টেশনে যায় আত্মহত্যা করতে ; একাই যায়!

প্রথমে ভেবেছিলো একখানা চিঠি লিখে যাবে। খসড়াও করেছিলো ;

প্রথম খসড়া

মল্লিকা,—মলি,

তুমি...তুমি আমার রাতের ঘুম,—দিনের কাজ নষ্ট করেছ !

কেন তুমি আবার এসে দাঁড়ালে আমার চোখের সামে ?

মল্লিকা ! মল্লিকা কলি—

কলি পর্যন্ত লিখেই প্রথম খসড়াটা ছিঁড়ে ফেললো ননী ; বড্ডো কাব্য হয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় খসড়া

মল্লিকা মল্লিক,—

আমার আত্মহত্যার জন্য তুমি ; শুধু তুমিই দায়ী !

—ননীগোপাল দে (ডবল বি. এ.)

দ্বিতীয়টা পড়ে তার মনে হ'ল এতে মল্লিকাকে নিয়ে পুলিশে টানা-হাঁচড়া করবে। দ্বিতীয় খসড়াটাও বরবাদ গেলো !

তৃতীয় খসড়া

মল্লিকা মল্লিক,—

আমার আত্মহত্যার জন্য তুমি দায়ী নও ; কোন রকমেই নও।

—ননীগোপাল দে (ডবল বি. এ.)

এটা পড়ে তার খটকা লাগলো ; যদি মল্লিকা দায়ীই না হবে তো সেকথা আবার লিখে যাওয়া কেন ? এ যেন হিমালয়ের ভ্রমণ-কাহিনী সম্বন্ধে কটু মন্তব্য করে তারপর লিখে দেওয়া যে, এ কটাক্ষ প্রবোধ সান্যালের কোনও বই সম্পর্কে নয় ! অনেকগুলি খসড়া করে ; ভারতীয় সংবিধান অথবা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চেয়েও সংখ্যায় বেশি খসড়া তৈরী করে ; ছিঁড়ে আবার তৈরী করে ; আবার ছিঁড়ে, প্যাডের পাতা যখন বাকী আর একখানা তখন তৈরী হ'ল মনের মত খসড়া।

শেষ খসড়া

আমার এই আত্মহত্যার জন্য কেহ দায়ী নহে; আমি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করিতে যাইতেছি। আরক্ষগণ যেন আমার এই অসময়োচিত স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্য কাহাকেও উৎপীড়ন না করে।

ইতি

শ্রীননীগোপাল দে (দ্বি-স্নাতক)

এতক্ষণে ননীর হৃদয়ঙ্গম হ'ল কেন কোনো খসড়াই তার পছন্দ হচ্ছিলো না; চলতি ভাষায় লিখছিলো বলে। আত্মহত্যার মতো ভয়াবহ গুরুগম্ভীর বিষয় প্রমথ চৌধুরীর বীরবলী ঢং-এ অচল। তার জন্য চাই সিরিয়স শব্দ প্রয়োগ; জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়র স্টাইলে। আত্মহত্যার ভাষাই সাধুভাষা; বিবেচনা করে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তবে শেষ খসড়াটি রচনা ক'রে নিজেরই রচনার দিকে তাকিয়ে নিজেই হাঁ হয়ে বসে রইল ননীগোপাল। তারপর খসড়াটা কোথায় লুকোলে সকলের চোখে পড়বে ভাবতে লাগলো ননীগোপাল।

সেই সময়েই তার হঠাৎ মনে হ'ল,—এই চিঠি লিখে রেখে যাওয়াটা হঠকারিতা হচ্ছে না তো? যদি কোনোও কারণে আত্মহত্যা করতে না পারে; যদি মল্লিকা এসে পথ আটকে দাঁড়ায়; যদি বলে: তোমাকে আত্মহত্যা করতে আমি দেব না। তখন? তখন কি হবে? এদিকে এই চিঠি যদি পুলিশ পায় তাহলে আত্মহত্যার চেষ্টার অভিযোগে তার জেল হয়ে যাবে। না থাক; দরকার নেই—। *Black and white* ফোঁকা ভালো; কিন্তু ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইটের মধ্যে যেতে বারণ করে গেছেন স্বয়ং চাণক্য না চন্দ্রগুপ্ত কে যেন; এই মুহূর্তে তা আর মনে পড়ে না বটে ননীর; তবে খসড়াটা ছিঁড়ে ফেলার কথা তার বেশ মনে থাকে। ছিঁড়ে ফেলে সে।

তারপর শীতের ভোরে বেরিয়ে পড়ে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে; ঢাকুরিয়া

লেকে নয়; ঢাকুরিয়া রেল স্টেশনের দিকে। রাস্তায় বেরিয়েই কুকুরের চীৎকারের মুখে পড়ে। কুকুরকে কেন যে অনর্থক বিশ্বাসী জন্তু বলে ননী কোনোও দিনই ভেবে পায় নি। কুকুর কাউকে বিশ্বাস করে না; সাজ্ঘাতিক চেঁচায়; কামড়ায় না; অথচ যে কোনো মুহূর্তে কামড়ে দিতে পারে এমন ভাব দেখায়। ভোর বেলায়; মাঝ রাতে; বাড়ী ফেরবার মুখে অথবা বাড়ী থেকে বেরুবার সময়ে কুকুরকে বিশ্বাস নেই; কুকুর চীৎকার করেই সব পণ্ড করে দিতে পারে। ননী অবশ্য জানে *Let the dogs bark*। কুকুরকে চীৎকার করতে দাও; তুমি যদি সত্যই বড় হও তো কুকুর যারা তারা চেঁচাবেই; তাতে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে এগিয়ে চল; স্বীয় পথ ধ্বজাধরি। কিন্তু সে তো কুকুর নয়; সে হচ্ছে *critic*; তারা কামড়ালে কিছু হয় না। এ যে সত্যি কুকুর। অন্য জানোয়ারের কামড়ে শুধু আতঙ্ক; কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক! তবুও, কুকুর দেখেও ননী আস্তে আস্তে, এ যেন তার নিজের বাড়ীর কম্পাউণ্ডে সে বেড়াচ্ছে এমন কায়দায় হাঁটতে লাগল; ফলে কুকুর আর কিছু বলল না বটে, তবে ননী পাহারায়লার পাল্লায় পড়লো।

কোউন হ্যায়?

হাম্!

হাম্ কোউন রে? কি ধার যাতে হো?

ননীর এতক্ষণে মনে পড়ল; সে হিন্দি শিখেছে। সে এবারে হাম না বলে ম্যঁয়্ বললো। ম্যাঁয় ডিউটিমে যাতা হুঁ।

কৌউন ডিউটিমে? কণ্ডাকটর হো তুম?

হাঁ!

হুম্! মালুম হুয়া! দে ব্যাটা আভি হামলোগকো গিয়া মাহিনাকো রূপেয়া দোও!

রূপেয়া?

হাঁ—হাঁ! ওদিন গাড়ী মে বোলা নেই কি দে জায়গা? বোল্‌কে ভাগ গিয়া! পাহারয়ালা ননীর কাছে এসে আপাদমস্তক দেখে বলে:

হাঁ! পাঁচ নম্বর বাসকো কণ্ডাকটর—দাগী হ্যায়—হান জানতা কি এক রোজ রাস্তামেই পাকাড় লেগা—

সত্যি সত্যি ননীর পকেটে একটা টাকা আর কয়েক আনা ছিলো; খুচরোটা রেখে টাকাটা নিয়ে তবে ছাড়লো সেপাই। ননী আবার হাঁটতে লাগলো। টাকা যে মাটি স্বয়ং সাধকরাও বোধ হয় এমন করে বোঝেন নি যেমন করে ননীর 'মালুম' হ'ল সেদিন। এর চেয়ে খানিকটা মাটি পকেটে থাকলেও কাজ দিত; টাকা ছিলো বলে রইলো না; মাটি থাকলে মাটি পকেটেই থাকত। তারপর ননী অবশ্য নিজেকে সান্ত্বনা দিলো; সান্ত্বনা দিলো এই বলে যে, সে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে তার আবার টাকায় কি হবে? এক টাকাতেই বা কী; আর এক লক্ষ টাকাতেই বা কী? একলক্ষ্যে সে এখন আত্মহত্যার রাস্তা ধরে এগুবে। বেশি দূর এগুতে হ'ল না দেখে ননী মুষড়ে পড়লো; সামনেই ঢাকুরিয়ার লেভেল ক্রসিং তখনও ঘোর অন্ধকার।

প্রথমবার ট্রেন আসতে ঝাঁপিয়ে পড়া হ'ল না ননীর; মন ঠিক করতে করতে ট্রেনখানা স্যাঁৎ করে বেরিয়ে গেলো নাকের ওপর দিয়ে; যাক! ননী এবার তৈরী হয়ে সিগারেট ধরালো দ্বিতীয় ট্রেনখানার জন্যে! এবারে আর রক্ষে নাই। ট্রেন আসার আগেই সে যাবে ট্রেনের তলায়। আর তারপর? তারপর মল্লিকার কাছে যাবে সেই খবর! মল্লিকা হায় গোড়াটায় বিশ্বাস করতেই চাইবে না তার কথাটা! হয়ত মল্লিকা ভাবতেই পারে নি' যে তার জন্যে কেউ সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করতে পারে! তারপর সত্যি সত্যি যখন জানা যাবে ননী গোপাল দে ডবল বি. এ. ট্রেনের তলায় পড়ে কাটা গেছে; তখন আর কেউ না জানুক এ বিশ্ব-সংসারে মল্লিকা অন্ততঃ তো জানবে যে ননী তারই জন্যে অকালে প্রাণ দিয়েছে! এবং তখন? তখন মল্লিকার হাপুস কান্না? সারা জীবন কি আপশোষ? সে কি মর্মভেদী গানঃ জীবনে যারে তুমি দাও নি মালা! (ননী প্রায় গেয়ে ফেলেছিল!) ননী যেন চর্মচক্ষে ব্যাপারটা দেখতে পায়; কিন্তু বেশীক্ষণ পাবার

আগেই চর্মচক্ষে দেখতে পায় ট্রেন আসছে! ব্যস! এবারে আর ভুল নয়! ননী শুয়ে পড়ে ট্রেন লাইনে!

ট্রেন আসে; হুইসিল বাজিয়ে চলে যায়। ননী মরে গেছে মনে করে হাত পা পর্যন্ত অনেকক্ষণই নাড়ায় না; ননী জানে মরলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়বার কথা নয়; কিন্তু ঢাকুরিয়ার মশা বোধ হয় মড়াকেও মরে পড়ে থাকতে দেয় না; ননীকে চটাশ করে পায়ের ওপর চাপড় দিতেই হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হয় সে মরে নি! তাহলে? তাহলে কি হ'ল ভাববার আগেই শোনে কে ডাকছে।

উঠে আসুন। ননী উঠে আসে বিনা বাক্য ব্যয়ে; এবং চলে যাওয়া ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে উপলব্ধি করে ব্যাপারটা! যে লাইনের ওপরে সে শুয়ে ছিলো ট্রেন সে লাইনে আসেই নি; পাশের লাইনের ওপর দিয়ে উল্টো দিকে চলে গেছে ট্রেন। বুঝে উঠতেই আবার শুনলো! কী .ব্যাপার স্যার? আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করছিলেন?

পুলিস হতে পারে জেনেও ননী বলে ফেলল : কী করে বুঝলেন?

ভদ্রলোক এবারে বলেন : সমব্যথী বলে বুঝলাম; আবার কী ক'রে বুঝতে হয়? অনেকক্ষণ ধরেই ওপার থেকে দেখছি আপনি এসে ওঁৎ পেতে বসে আছেন মরবার জন্যে! যাক! মরা যখন হ'ল না আসুন ধ্রুব কেবিনে একটু চা খেয়ে আসা যাক! কী বলেন? আপত্তি আছে?

ননী বলল : না; আপনি যান। আপনার হয়ত মত বদলেছে! আমি কিন্তু মরবই; মরবার আগে এক পাও নড়ব না—

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন : নড়তে হ'ল তো মরবার পর আর অসম্ভব; নড়তে হ'ল এখুনই নড়ুন; কিন্তু সে না হয় মরবেন; তবে তার তো এখনও দেড় ঘণ্টা বাকী?

ননী : বাকী কেন? এখনি মরবো আমি—

ভদ্রলোক : কী করে মরবেন?

ননী ঃ কেন, যা করে মরতে চেয়েছিলাম! ট্রেনের তলায় পড়ে মরব—

ভদ্রলোক ঃ *Next* ট্রেন দেড় ঘণ্টা বাদে—!

অগত্যা ননী চা খেতে ঢোকে ভদ্রলোকের সঙ্গে ধ্রুব কেবিনে। তারপর দু'জনের কাছে দু'জনের দুঃখের কাহিনী বলে। ননী প্রথমেই বলে; মল্লিকার নাম ধাম বাদ দিয়ে সমস্ত ঘটনাটাই বলে।

সমস্ত শুনে ভদ্রলোক মন্তব্য করেন ঃ আপনি তো এমনিতেই মারা যেতেন; এর জন্যে কষ্ট করে ট্রেনের তলায় পড়ার দরকার কি ছিলো?

কিসে মারা যেতে পারতাম আমি? করোনারী থ্রম্বসিসে?—ননী জিজ্ঞেস করে।

ঠিকই বলেছেন; ভদ্রলোক জানান ঃ তবে করোনারী নয়; পরনারী থ্রম্বসিসেই মারা যেতেন আপনি কিছু দিনের মধ্যেই! তারপর একটু থেমে বলেন ঃ শুনুন; আপনার বয়স কম; তাই ভাবছেন যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন তাকে যখন বিয়ে করতে পারেন নি তখন আর জীবনের দাম কি? জীবনের অনেক দাম। বিয়ে না করলে জীবনের দাম অনেক; বিয়ে করেন নি বেঁচে গেছেন; আপনার আবার দুঃখ কিসের! শুনবেন তবে আমার জ্বালা? বিয়ে করেছি বলেই; বউ-এর জন্যই আজ আমায় আত্মহত্যা করতে আসতে হয়েছে, তা জানেন?

না;—ননীর স্বর নরম খুব!

কী করে আর জানবেন? এই তো প্রথম দেখা! শুনুন আমার দুঃখের আরব্যোপন্যাস! বিয়ে করবার সময়; ফুলশয্যার রাতে যাকে ভেবেছিলাম স্বপ্ন; সেই বউ যে মানুষের জীবনে মূর্তিমান এক দুঃস্বপ্ন, কে জানতো তা? মশায় মুশুরির ডালে পেঁয়াজ দিতে দেবে না; জ্যান্ত মাছ বাড়ীতে আনতে দেবে না; মাগুর,

সিঙি, কই, শোল বাজার থেকে আনা চলবে না; রাতে ইসপ্‌গুল খেয়ে শুতে হবে; গরমকালে পাঁচবার; শীতকালে তিনবার চান করতে হবে! গায়ে সাবান মাখা চলবে না; ব্যসম মাখতে হবে—! এসবও একরকম ছিলো! নিজের ছেলেমেয়ে তারা অন্যায় করলে বকতে পাব না; কেন?—না, তাতে তাদের কচি মনে এমন আঘাত লাগতে পারে যে তারা চিরকালের মত বিগড়ে যেতে পারে! এতেই শেষ নয়; যখন অন্যায় করবে তখন যদি বকা না যায়, বাদ যায় যদি একবার; তাহলে পরে আর সে-ব্যাপারে বলা যাবে না কিছু! ফৌজদারী আইন আর কি! ফাঁসীর আসামীকে একবারে ফাঁসাতে না পারলে; পরে যতই প্রমাণপত্তর হাতে আসুক, তা'কে নিয়ে হাঁসফাঁস করলে লাভ হবে না কিছু! আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার ছেলেমেয়েরা গিয়েছিলো সাঁত্রাগাছি; সেখানে কুয়োর পাড়ে উঠে পড়ে মরবার উপক্রম করেছিলো আমার ছোট ছেলে; বুঝেছেন? কিন্তু তারজন্যে কলকাতায় সে ফিরে এলে তাকে বলতে পারলাম কিছু? পারলাম না। কারণ তাকে বকতে হলে আবার সাঁত্রাগাছি যেতে হবে। সাঁত্রাগাছি গেলেই হবে না; আবার কুয়োর পাড়ে উঠে মরবার উপক্রম করলে সেই ছেলে তবে তাকে বলা যাবে; বলা যাবে মানে বকা যাবে না কিন্তু! তার কচি মন,—বিগড়ে যেতে কতক্ষণ? তাই তাকে বোঝাতে হবে যে কুয়োর পাড়ে উঠে এরকম অনেক ছেলে কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছে! বিলেতি বই থেকে এইরকম কুয়োয় পড়ে যাওয়ার ছবি দেখাতে পারলে আরও ভালো হয় নাকি? হবেও বা!

একদমে এতদূর পর্যন্ত বলে সেই ভদ্রলোক এবারে একটু থামেন; থামতে বাধ্য হন। সেই ফাঁকে ননী এবারে মুখ খোলে। জিজ্ঞেস করে: কিন্তু এসব তো আপনার সয়ে এসেছিলো; তাহলে হঠাৎ আত্মহত্যা করবার জন্য ক্ষেপে উঠলেন কেন? নিশ্চয়ই আরোও গুরুতর কোনও কারণে—?

হ্যাঁ! ভদ্রলোক দম নেন আবার: বলেন কেন? আমার বউ

গিয়েছিলো কোথায়; সেখানে তার ছেলেবেলার কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে মাথা খারাপ হয়ে গেছে তার; কেবল বলছে তার সঙ্গে বিয়ে হলে কত মধুর হতো জীবন! আর শুধু তাই? সেই হতভাগার কি যেন নাম? ননীগোপাল না কি! তার জন্যে হাপুস কান্না! কারণ কি? আমি শুধু বি. এ.। আর সে হতচ্ছাড়া ডবল বি. এ.! তাইতেই রাগ করে বেরিয়ে পড়লাম আজ আত্মহত্যা করতে; দেখি ননীগোপাল কেমন দুঃখ:দূর করে?—

ননীগোপাল উঠে দাঁড়ায়; দাঁড়ায় না তারপর; বেরিয়ে পড়ে; চোঁদৌড় দিতে চায়। ভদ্রলোক ননীর জামা চেপে ধরেন; দাঁড়ান দাদা; আর একটুখানি! জানি; আপনি আত্মহত্যা করতে আসেনওনি; আত্মহত্যা করবেনও না! কিন্তু আমার আত্মহত্যা ছাড়া উপায় নেই! শুধু আমার স্ত্রীকে বলবেন—! আমার নাম রঞ্জন মল্লিক; আমার স্ত্রীর নাম মল্লিকা; এই নিন ঠিকানা; মল্লিকাকে বলবেন আমি মরে ভূত হয়ে এসে ননীগোপালকে খুঁজে বার করে তার ঘাড়ে চাপবো!—হাঁ! তবেই আমার নাম—

নাম শোনার জন্য আবার ননী আর দাঁড়ায় না; নাম শোনা হয়ে গেছে তার। জামা ছাড়িয়ে নিয়ে সে দৌড়তে থাকে। বাবা! মল্লিকাকে সে বিয়ে করতে না পেরে আত্মহত্যা করতে এসেছিলো! বিয়ে করে নি ভাগ্যিস! তাহলে আত্মহত্যা না করে ফেরার উপায় ছিলো আর!

আট

আত্মহত্যা করতে গেছিল ননী; ফিরে এলো আমাকে হত্যা করতেই বোধ হয়। সঙ্গে যোগ দিল,—কে আবার? প্রহ্লাদ দত্ত! ব্যাপারটা তাহলে শুনুন :

এবারের দুর্গা পূজায় দুর্গতির যেটুকু বাকী ছিলো সেটুকু সম্পূর্ণ হলো। মা দুর্গার নয়; আমার। পুজোর ছুটির ঠিক মুখেই, বাঘের মুখে পড়লেও এর চেয়ে ভালো ছিলো; পড়লাম বৌ-এর মুখে। একেবারে মুখোমুখী পড়ে গেলাম। রোজ সকাল না হতেই বেরিয়ে পড়ি; ফিরি রাতে। ফিরেই শুয়ে পড়ি। রাতে বৌ কোনও সংসারের কথা বলতে এলেই বলি, হ্যাঁ গো?—তোমার প্রাণে মায়া-দয়া নেই? মুখে রক্ত তুলে সারাদিন কাজ করে, এবার বিশ্রাম নেব একটু; এখন এলে সংসারের কথা বলতে? কাল সকালে শুনবো, পালিয়ে যাচ্ছি না তো! পরের দিন সকালে কিন্তু পালিয়েই যাই। বৌ, ঠাকুর ঘর থেকে নামবার আগেই আমি ঘরের বাইরে! এমনি করে ঘরে বাইরে চোর-পুলিশ খেলে একরকম চলে যাচ্ছিলো; কিন্তু একদিন তা অচল হল। চোরই পুলিশের হাতে ধরা পড়ল, না পুলিশ চোরের হাতে, এখন আর তা' মনে নেই। শুধু মনে আছে একদিন বৌ-এর কাছে 'ক্যাশ' ধরা পড়ে গেলুম, যাকে সংস্কৃতয় বলেছে : '*caught red handed*!'

বেরোবার জন্যে পা বাড়িয়েছিলাম; শুনলাম, সেই ডাক, যে ডাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সবাই কাঁপে, সেই চিরকালের ডাক; বামা কণ্ঠের, শুনছ? না শুনে উপায় আছে! বৌ কোনও 'ভূমিকা' না করে বললে : রাত্তিরে কথা বলতে গেলে বল, বিশ্রামের সময় আবার কথা কী? সকাল বেলায় কথা বলবার আগেই হাওয়া; তাহলে কথাটা বলব কখন এবং কাকে?

অপ্রস্তুত না হবার অভিনয় করে বলি; আ-হা! হাওয়া হয়ে যাবো কেন? আমি তো কথা শোনবার জন্যে কান পেতেই আছি; নাও বলো, কী বলবে?

ওরকম করে কথা হয়? বন্ধুদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে ফের বাসে তুলে দিয়ে আসবার নাম করে আবার কিছুক্ষণ চালাও মৌতাত; আর আমার দুটো কথা শোনবার বেলাতেই তোমার তাড়া বড় বেশী, না? দরকার নেই কথা বলে।

বৌ আমার দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, আমিও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে বাধ্য হই বাইরের দিকে; ঘরে ঢুকি আবার। ল্যাজ-ট্যাজ গুটিয়ে পুনর্মূষিকের মত আমার আবার ঘরে ঢোকা।

'নাও, এই বসলাম; কী বলবে, যতক্ষণ ধরে বলতে চাও, বলো।' বৌ-এর সামনা-সামনি বসে, আমার মনের অবস্থা সেই মুহূর্তে যেন এসপার ওসপার যা হয়·একটা কিছু হোক আজকে; হয়ে যাক আর কি! মানে, হয় বৌ, নয় আমি একজনও হয় না থাক, নয় থাকা যাবে দু'জনায়। রোজ ড্র ভালো লাগে না; হয় ইষ্টবেঙ্গল না হয় মোহনবাগান, যে কেউ পেয়ে যাক আজকে! তারপর বাঁচা যাক, 'দুত্তোর' বলে!

বৌ বলল: 'তোমার বন্ধু প্রহ্লাদবাবু এসেছিলেন—'

ব্যস! হয়ে গেল আমার! শুধু বসেছিলাম এতক্ষণ; এবারে মাথায় হাত দিয়ে বসি। প্রহ্লাদ এসেছিল; কী সর্বনাশ! আমি ছিলামনা যখন, তখন এসেছিল; তার মানে বৌ-এর কাছে কী বলে গেছে কে জানে? ভার ভার বৌ-এর মুখ; কিন্তু দেখে বোঝা ভার, কতখানি বলে গেছে! এবং কী বলে গেছে? কোন লাইন ধরে এবার তার অগ্রগতি এবং আমার দুর্গতি!

প্রহ্লাদ আমার কতদিনের বন্ধু জিজ্ঞেস করবেন না দোহাই! কারণ সে আমার বন্ধু কি বন্ধুর বেশে বিভীষণ, তাই আমার গুলিয়ে যায় মাঝে মাঝে! তবে যদি বন্ধুও হয়, তাহলে তার মতো বন্ধু যেন

আর কারুর না জোটে! প্রহ্লাদের ডাক নাম ঘেঁচু; সমস্ত দাগী আসামীর মতই ওর আসল নাম ভুলে গেছে সবাই; এলায়েস অমুক, এলায়েস তমুক হতে হতে শেষ পাকা নাম দাঁড়ানোর মতো, ওর নামও এখন আমাদের কাছে পাকাপাকিভাবে ঘেঁচু-ই!

'ঘেঁচু', এই নামের চেয়ে ঘেঁচু নামটা কেমনভাবে বর্তালো, সে ইতিহাস কম কৌতূহলের নয়। প্রত্যেক কথায় ঘেঁচু হবে' বলার অভ্যেস থেকেই এই নামের আবির্ভাব। হয়তো একটা 'লেখা' পড়ে শুনিয়ে বলেছিঃ লেখাটা খুব ভাল হবে, নারে? সঙ্গে সঙ্গে সাফ জবাব এসেছেঃ ঘেঁচু হবে; পিকনিকের বন্দোবস্ত করে মত নিতে যাওয়াই ভুল হয়েছে; কে যেন বলে বসেছেঃ খুব জমজমাট হবে! এক মুহূর্তের অপেক্ষা সয় কি, সঙ্গে সঙ্গে নস্যাৎ করবার সেই মূল্যবান মন্তব্যেরঃ ঘেঁচু হবে; আস্তে আস্তে জবাবদাতার নাম জাহির হলঃ ঘেঁচু; ঘেঁচু সেই থেকে ঘেঁচু-ই!

কিন্তু ঘেঁচুকে শুধু ঘেঁচু বললে ঘেঁচু হয়! সে যেমন ঠিক তেমনি আছে। আমাদেরই একজনের নাক কেটে আমাদের আর বাকী সকলের যাত্রা ভঙ্গের আনন্দে সে এখনও আত্মহারা হয়। শুধু ভঙ্গ কেন ছত্রভঙ্গ করে তবেই সে থামে! এই সেদিন,—নিজেদের মধ্যে আমরা ক'জন পরস্ত্রীকাতর আলোচনা করছিলাম। এমন সময় আমাদের মধ্যেই কে যেন, কে আবার,—আমি ছাড়া, আমি বুঝি বলেছি যে, আমাদের বৌগুলো কেমন যেন আলুভাতে মার্কা! তেমন স্মার্ট নয় পরের বৌ-দের মতো! ব্যস! বাড়ী ফিরে, এর ক'দিন বাদে, একদিন শুনিঃ বাড়ীতে কেন আবার?—আমি তো আলুভাতে,—স্মার্ট নই; যারা স্মার্ট, তারা পাত্তা দিল না বুঝি?—শুধু আমার বৌ নয়, আমাদের আরেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিমু, এবং ঘেঁচু নিজে, দু'জনের বৌ-ই জেনেছে সে কথা ততদিনে! (বলিনি বুঝি? ননী-গোপালকে লেং যে মেরে দিয়ে ইতিমধ্যেই প্রহ্লাদ স্বামীত্ব লাভ করেছে সোনালী সোমের!) ঘেঁচুকে গিয়ে ধরতে, সমস্ত মুখটাকে করুণ

করবার প্রচেষ্টায় শুয়োরের মত ক'রে, ঘেঁচু বলল : ভাই বলে ফেলে বুঝলাম, বলাটা বোধ হয় ঠিক হয় নি!

শুধু কী একবার?—বার বার! রাত্তির দশটায় হাজরাবালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের মোড়ের চায়ের দোকানে ঢোকা হয়েছে। ঘেঁচু-ই বললে কথাটা; বললে : বাড়ীতে বৌরা ভাবছে আমরা কী রকম খাটছি,—কত কাজ করছি! সে নিজে এবং আমরা সবাই কথাটার ওপর অট্টহাসি হাসলাম। তারপর সেই ঘেঁচু সে কথা সকলের বৌ-এর কাছে যথারীতি পরিবেশন করলে কোনও এক তিনটে-ছটা-নটায়। এবং ঘেঁচুকে কিছু বলবার আগেই তার সেই বিখ্যাত শুয়োরের করুণ মুখ স্পষ্ট বলছে যেন শুনতে পেলাম : এখন বুঝতে পারছি বলটা বোধ হয় ঠিক হয় নি!

এ-হেন ঘেঁচু যার আসল নাম প্রহ্লাদ; সেদিন বৌ-এর কাছে নতুন কী বলে যেতে পারে, তাই ভাবছিলাম। বৌকে জিজ্ঞেস করি : ঘেঁচু এসেছিলো? হুম! কী বলে গেছে শুনি?

ঘেঁচুবাবু, তার বৌ নিয়ে দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন বেড়াতে যাচ্ছেন। বৌ বলল।

ভালো কাজ করছেন—আমার সরষোক্তি; এই কথা বলবার জন্যেই এসেছিলো নাকি?

না; আরও বলে গেলেন : ননীগোপালবাবু যাচ্ছেন নৈনিতাল। নিমুবাবু কাশ্মীর। রাজুবাবু—

থাক! থাক! যে যেখানে যাক, আমরা কোথাও যাচ্ছি না—পাকা কথায় বৌ-এর সমস্ত বক্তব্যের তলায় যে আসল আবেদন তাকে নাকচ করে আমি বেরিয়ে পড়ি। বেরিয়ে পড়ি ঘেঁচুর উদ্দেশ্যে!

আমি ভেবে পাই না পুজোর সময় লোকের এই বাইরে যাওয়া কেন? বাইরে যাওয়ার মতো টাকাই বা আসে কোথা থেকে! পুজোর সময় বাকী বকেয়ার জন্যে তাগাদার ফলে ঘরের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকাই মুস্কিল, তায় আবার বাইরে বেরুবার চেষ্টা! অথচ পুজোর পর

কারুর সঙ্গে দেখা হলে প্রথম প্রশ্নই হচ্ছে; 'পুজোয় কোথায় গেসলেন?' এ প্রশ্নের উত্তরে আগে আগে বলতাম, দার্জিলিং, পুরী, কি শিলং, যে নাম গোড়ায় মনে আসত, বলে দিতাম ফট করে। কিন্তু একবার কাকে 'পুরী' বলে, কী ফ্যাসাদ? সে মক্কেল সেবারে মরতে পুরী গেছিলো আবার। বলে কী,—'পুরী গেছিলেন? কবে? আমিও তো গেছিলাম, দেখিনি তো? সেই থেকে এখন বলি, সোজাসুজিই বলি : না, কোথাও যাওয়া হয়নি, এখানেই ছিলাম। এবং প্রশ্ন কর্তার মুখের অবস্থা দেখবার জন্যে না দাঁড়িয়ে থেকে প্রস্থান করি। কেন, বলব নাই বা কেন? আমি তো আর ব্যারিষ্টার নই; যে পুজোর ছুটিতে বেড়াতে না গেলে, পুজোর ছুটির পর এটর্ণী কেস দেবে না আর!

কিন্তু আমি একা হলে এসে যেত না; আমি যে *single* নই; *worried* (অর্থাৎ *Married*)! পাড়ার যারা মেয়ে বৌ, তাঁরা অন্য সময় প্রশ্ন করেন : কী দিয়ে খেলে? এখন তাঁদের আমার বৌয়ের কাছে একমাত্র জিজ্ঞাসা : পুজোয় কোথায় যাওয়া হচ্ছে? 'এখন' মানে, এখানে, পুজোর ঠিক আগের কথা বলছি!

বলব কী, সত্যি সত্যি, ননী আর প্রহ্লাদ, ওরা বেরিয়ে গেল নাকের ওপর দিয়ে। আমার ক্ষেত্রে অবশ্য 'নাক' না বলে চোখের ওপর দিয়ে বলাই ভালো; কারণ জন্ম থেকেই আমার নাক নেপালীদের মত; অথবা চীনাদের মত (নতুন এবং পুরাণো চীনার এই একজায়গাতে মিল; কারুরই নাক নেই।) কিম্বা চীনা বাদামের মতও বলা যায় তাকে। পুজোর ছুটির অনেক আগেই বেরিয়ে গেল; দিল্লী, নৈনিতাল, কাশ্মীর। যাবার সময় বলে গেলো বৌকে : কর্তাকে বলুন, এবারে বেরুতে, আর যাবে কবে?

তাই আমাকেও বেরুতে হল; বৌ, ছেলে মেয়ে নিয়ে 'উলুবেড়ে' অব্দি অন্ততঃ যাবই, ঠিক করলাম। বৌ, ছেলে মেয়ে তো ক্ষেপে ফায়ার ব্রিগেড! প্রবোধ সান্যালের গল্প করে বললাম : 'আনন্দ

নেই বাইরে কোথাও। মানুষের অন্তরই হচ্ছে আনন্দের উৎস। সেই কাণায় কাণায় ভরা মন নিয়ে…'

এই অবধি বলতেই বৌ উঠে গেল। এ আবার কি হল? আমি বসে ভাবতে থাকি। প্রবোধ সান্যাল তো শুনতে পাই মেয়েদের সবচেয়ে প্রিয় লেখক! তবে? আমার বৌ কি সত্যিই আলুভাতে নয়? আলু-ভাতে হলে প্রবোধ সান্যালের লেখা পড়বার সময়ে উঠে যাওয়া সম্ভব?

অগত্যা রবিঠাকুরের কবিতায় বলি: 'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া, দেখ হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশির বিন্দু!' কিন্তু না কিছুতেই কিছু হয় না।

তারপর মেয়েদের যেমন সব ব্যাপারেই 'না, না' করতে শেষে রাজী হওয়া; তেমনি বহু ধস্তাধস্তি, মন কষাকষির পর গৃহিনীর শেষ পর্যন্ত উলুবেড়ে যেতে সম্মতি! বোধ হয় ভাবলো: কলকাতার বাইরে তবু তো! পাড়াপড়শীর কাছে কোথায় গেসলাম না বলে কলকাতার বাইরে বললেও তবু মুখ রক্ষে হবে!

অবশেষে দুপুর বারোটায় একদিন উলুবেড়ে গিয়ে পেঁছিলাম। সন্ধ্যে পর্যন্ত বৌ মুখ গোঁজ করে রইল। তারপর সন্ধ্যোয় বেরুলো জায়গাটা দেখতে। বাড়ীতে একা রইলাম আমি। ফিরে এলো একটু বাদেই। সঙ্গে আরও কার কার আওয়াজ পেলাম।

বৌয়ের চেহারাই অন্য। সেই ফুলশয্যার রাতের ফুলপরী যেন। প্রফুল্লবদনা। সহাস্যললনা। বরাভয় মূর্তি। কী ব্যাপার? হাঁফাতে হাঁফাতে বৌ বললে, আনন্দে লাফাতে লাফাতে ওপরে এসে বললে: এতদিনে তোমাকে চিনতে পারলাম; বলে দম নিতে লাগল। আমিও বেদম খুসীতে চোখ বুঁজে ভাবলাম, নিজের বৌ বলছে এমন কথা! তারপর দম নিয়ে বললে আসল কথাটা: প্রহ্লাদ আর ননীবাবু ওরা সবাই এই উলুবেড়েতেই এসেছেন। ঘেঁচুবাবু বললেন: ওরা ভেবে দেখলেন হঠাৎ যে দিল্লী, নৈনিতাল কাশ্মীরের চেয়ে নাকি উলুবেড়ে ঢের ভালো জায়গা। জল-হাওয়া খুব উপকারী। খাবার সস্তা।

নীচে থেকে ঘেঁচু তথা প্রহ্লাদের গলা কান ফাটানো ঃ নেমে আয়।

সেইখানে শুধু প্রহ্লাদ ননীগোপল নয় ; সেবার পুজোয় মানসীও এলো ; তার জ্যাঠাকে দিয়ে। নতুন করে জমে উঠলো নাটক ; মনে হল উলুবেড়েই ননীর জীবনে প্রথম উলু দেবে ; মনে হল ; বেড়ে জায়গা বুঝি এই উলুবেড়ে।

মল্লিকার সেই হৃদয়হীন ঘটনার পর এই উলুবেড়িয়ার ননীগৃহ দুয়ারে দেখা যায় মানসীকে। ননীর সেই একমাত্র আদি ও অকৃত্রিম মানসীই দাঁড়িয়ে ননীর অপেক্ষায়।

তুমি ?—ননী যেন বিশ্বাস করতেই পারে না !

হ্যাঁ ঃ আমিই—মানসী হাসে ঃ এসো আমার সঙ্গে জ্যাঠামশায়ের কাছে ; কথা আছে—

মানসী জ্যাঠামশায়ের নাম বলতেই ঘাবড়ালো ননীগোপাল দে ডবল বি, এ, ; অবিবাহিত প্রতিভাবান যুবক।

ননী ঃ তোমার জ্যাঠার কাছে আবার ?

মানসী হেসে ফেলল ; না , না,—এস ! ভয় নেই !

তাকিয়ে তাকিয়ে ননী দেখতে লাগলো মানসীকে। আরও অপরূপ হয়েছে মানসী ; আরও রমনীয়। কালো শাড়ি পরেছে মানসী, ফর্সা রং ফেটে পড়ছে যেন। অলকে কুসুম জড়ানো ; অল্প অল্প গন্ধ আসছে তার। গলায় দুলছে হার ; হাতে বাজছে চুড়ি , ঠোঁটের কোণে ওকি হাসি ? আলো-চোখের কালো-পাতায় ওকি তুস্তর লজ্জা। কে জানে ! বেভুল বাতাস আজ কি যে বকছে , দূর থেকে ভেসে আসা গানের সুরের মত ; বোঝা যায় ; কিন্তু ধরা যায় না ! ননী যেতে যেতে ভাবলো সেই মানসী তার জীবনে এলো ; এতদিন আসতে কি হয়েছিলো ? আর এলো যদি তো আবার জ্যাঠা কেন ? আবার যদি সব এলোমেলো হয়ে যায় !

জ্যাঠামশাই বসে আছে নবরত্নসভা আলো করে। মানসী ননীকে

সেখানে হাজির করিয়ে দিয়েই চলে গেল। নবরত্ন সভাভঙ্গের পর তবে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে কথা হবে। ননী বসে রইল বাংলা ছবিতে ভীড়ের দৃশ্যে মুখ দেখানো পাড়ায় সৌখীন অভিনয়ের আসরের বিখ্যাত প্লেয়ারের মতো নির্বাক ভূমিকায়। সভা ভঙ্গ হলো বেলা দুটোয়; ক্ষিদেয় ননীর পেট তখন ভরে গেছে। জ্যাঠামশায় বললেনঃ তুমি জানো তোমার সঙ্গে মানসীর বিবাহ আমি অনুমোদন করি না; কিন্তু মানসী তোমাকে ছাড়া আর কাউকে মাল্যদান করতে অনিচ্ছুক; এমতাবস্থায় তোমার হস্তে মানসীকে অর্পণ করতে আমি আমার বিবেকবিরুদ্ধ আচরণে একপ্রকার বাধ্য হয়েছি। সে যা হোক, তুমি চাকরী কর?

ননী ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ; খবরের কাগজের অফিসে—

জ্যাঠা ঃ কত মাসিক মাহিনা?

ননী ঃ আড়াইশো—

জ্যাঠা ঃ তাতে বিবাহিত জীবনের ব্যয় নির্বাহ অসম্ভব—

ননী ঃ মাইনে পরে বাড়বে—

জ্যাঠা ঃ ছেলেপিলেও হবে যে।

ননী ঃ তাহলে?

জ্যাঠা ঃ শোন, মানসীকে যদিও আমি বাক্যদান করেছি যে তোমার হস্তেই তাকে সম্প্রদান করব আমার সুস্পষ্ট বিরুদ্ধ মত সত্ত্বেও কিন্তু সে কেবলমাত্র এক সর্তে। সে-সর্ত হচ্ছে এই যে তোমার মাহিনা যথেষ্ট মনে করলে তবেই এ-বিবাহ কার্যকরী করা যাবে, নচেৎ অসম্ভব। আড়াই শত টাকা মাসিক মাহিনায় সংসার করা কষ্টসাধ্য, মানসীকে কষ্ট দিতে পারব না আমি—

ননী ঃ তাহলে?

জ্যাঠা ঃ আজ থেকে এক মাসের মধ্যে আমাকে এসে প্রমাণ-পত্র সমেত দেখাতে হবে যে, তোমার অন্তত দুশো ষাট টাকা মাইনে হয়েছে—! এখন যাও!

ননী, 'আচ্ছা' বলে বেরিয়ে পড়ে। একবার ভেবেছিলো জিজ্ঞেস

করে যে, আড়াইশোতে চলা কষ্টসাধ্য হলে ; দুশো যাটে কেমন করে সহজসাধ্য হবে সংসার চলা। জিজ্ঞেস করেনি ভয়ে ; যদি আবার পাকা ঘুঁটি ঘরে উঠবার মুখে কেঁচে যায়! দরকার কী? তীরে এসে তরী ডোবে যদি?

সে রাতে আবার ঘুমোতে পারলো না ননী। মানসীমঙ্গল কাব্য থেমে ছিলো মঙ্গলাচরণ পর্যন্ত এগিয়েই। আজ তার প্রথম স্বর্গ আরম্ভ করতে গিয়ে একটি বিকেলের কথা বিশেষ করে মনে পড়লো ননীগোপাল দে ডবল বি, এ-র। সেদিন প্রথম মানসী তাকে ভালোবাসে বুঝতে পেরেছিলো তার মত বিশ্বনির্বোধও! তার মত *fool*-কে মাথায় যে চার ফিট দশ ইঞ্চি, তাকেও যে ভালোবাসতে পারে মানসীর মতো কোনও *beautiful* এই পরমাশ্চর্য অথচ অসম্ভব ঘটনার স্মৃতিতে আজও তার বুক কাঁপে! সেদিন সে প্রথম আদর করেছিলো মানসীকে! কোথা থেকে এত দুঃসাহস এসেছিলো তার ; ঝোড়ো বাতাসই শুধু জানে সে কথা! তারপর আজ আবার সেই মানসী এসে দাঁড়িয়েছে তার জীবনে। এই দিনটির ডায়েরীতে সেই দিনটির কথা লেখা থাক অশ্রুজলের হাসিতে ; উপছে পড়া খুসীর বেদনায়ঃ

মানসী মঙ্গল

॥ প্রথম সর্গ ॥

অমর হোক তেসরা জুন ; আষাঢ়-বৈকাল।
এই জীবনে প্রথম ভালো বেসেছি ওই কাল্—
বেভুল-বাতাস বাইরে তখন বকছে এলোমেলো !
আঁধার হয়ে আসছে আকাশ ; এমন সময় এলো।—
আলো-চোখের কালো পাতায় হাসছে যে বিজলী
সেই যে মেয়ে ; দেখছি চেয়ে, করছি বলি বলি,—
বলার কথা পড়ছে মনে যাবার কত পর !
সেই কথাটাই খাতার পাতায় লিখছি অতঃপর ;
নতুন বধূর স্বপ্নে মধুর সে-কোন্ শকুন্তলা—
কাঁদা-হাসার ; ভালোবাসায় ফাগুন যে উতলা।:
আষাঢ় মাসে ফাগুন আসা ;—বৃষ্টিজলে হোলি !
উজ্জয়িনী হচ্ছে মনে এই যে অন্ধ গলি।
মাথায় মুকুট নেই তা বটে ! তবু আমার রাণী,
তোমার ডাকে, এই আমাকে, রাজা বলেই মানি :
তুচ্ছ রাজ্য ; বিশ্বভুবন বিলাই অকাতরে—
তোমার গালের, চিরকালের, একটি তিলের তরে।

অমর হোক্ তেসরা জুন ; আষাঢ়-বৈকাল !
এই জীবনে প্রথম ভালো বেসেছি ওই কাল।

নয়

চাকরী সত্যিই ননীগোপাল পেয়েছিলো ; ননীগোপাল দে ডবল বি. এ. ; অবিবাহিত প্রতিভাবান যুবক। খবরের কাগজের অফিসেই ; তবে দৈনিক নয় ; সাপ্তাহিক খবরের কাগজে। প্রথমে অবশ্য দৈনিকেই পেয়েছিলো ; কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার পরই ননীগোপাল স্থানান্তরিত হলো সাপ্তাহিকে। স্থানান্তরের নোটিশ দিতে বাধ্য হলেন দৈনিকের কতৃপক্ষ। ননীগোপাল দৈনিকে যেদিন প্রথম নিয়োগপত্র পেল সেইদিনই তাকে পাঠানো হলো রিপোর্টার করে ; গান্ধীজী তখন বেঁচে এবং বেলেঘাটায় রয়েছেন। সেই মহান ব্যক্তির সান্নিধ্যে ননী উপস্থিত হতে পেরে ধন্য হলো। সারাদিন সেখানে কাটাবার পর যথারীতি ননী রাতে রিপোর্ট দিলো। সাক্ষাৎকারের পরের দিন সেই দৈনিকে 'গান্ধীজী বেলিয়াঘাটায়' এই শিরোনামায় পুরো এক কলম সাদা জায়গা সাদাই রইলো ; কোনও রিপোর্ট নেই সেখানে ; একটি লাইনও না।

দৈনিক সংবাদ পত্রের ইতিহাসে এই প্রথম ; এই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতায় যখন সারা শহরে দারুণ চাঞ্চল্য তখন কর্তৃপক্ষ ডেকে পাঠালেন ননীকে। সাদা খালি জায়গাটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কাল বেলেঘাটায় গান্ধী শিবিরে যান নি ?

ননী মাথা নেড়ে বোঝায় : হ্যাঁ।

তবে ? কিছু রিপোর্ট দেন নি কেন ? সাদা খালি জায়গা থাকে নাকি খবর কাগজে ?

কী করব ? ননীর বিনীত উত্তর : কাল যে বাপুজী মৌন দিবস পালন করছিলেন—

চেয়ারে বসেছিলেন খাড়া হয়ে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ; উত্তর

শোনবার সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়েন। পুরো বাহাত্তর ঘণ্টা বাদে জ্ঞান হয় ; অজ্ঞান হবার আগেই অবশ্য ননীকে সাপ্তাহিকে চালান করে দিয়ে যান ; ওই দৈনিক কাগজেরই একখানা বাংলা সাপ্তাহিক ছিলো ; ছিলো মানে দৈনিকের চেয়ে সেটাই চালু ছিলো বেশি। ননী সেদিন থেকে সেই সাপ্তাহিকে কাজ করছে। সাপ্তাহিক কাগজখানার নাম 'সংবাদ'। এই কাগজের সম্পাদক গোবর্ধন রায় ; তিনি ভারি মাই-ডিয়ার লোক ; থেকে থেকে শুধু 'জল' খান।

সাপ্তাহিক 'সংবাদ' পত্রিকায় ঢুকবার পর ননী যখন পত্রিকা জগতের কাণ্ডকারখানা প্রথম প্রত্যক্ষ করছে ; চোখের সামনে সব রক্তমাংসের নাটক অভিনীত হতে দেখছে ; ঠিক তখনই তার জীবনে নাটকের চরম দৃশ্যে যবনিকা উঠলো। মানসীর জ্যাঠামশাই বলেছেন 'মাইনে না বাড়লে মানসীর সঙ্গে বিয়ে হবে না ; ওদিকে সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক গোবর্ধনবাবু বলছেন, 'বিয়ে না হলে মাইনে বাড়বে না।' ননী ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছে না কি করবে ; এবং ঠিক সেই সময়ে সেই বরাবরের মত দেখা যাচ্ছে প্রহ্লাদ দত্ত এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়।

প্রহ্লাদ ঢুকেই একগাল হাসে ; কিন্তু ননী হাসে না। প্রহ্লাদ এবারে এক গাল্ পাড়ে ; বিচ্ছিরি এক গালাগাল দেয় ননীকে। ননী ক্ষেপে যায় ; দেখো প্রহ্লাদ,—আর এক গাল্ পাড়লে আরেক গাল্ পড়বার কথা মনে রেখো। প্রহ্লাদ বোঝে যে ননী ঠাট্টা করছে না ; থেমে যায় সে। গলার স্বর নামিয়ে আনে : কী হয়েছে ননী ?

ননী : ইচ্ছে হয় চুপ করে বসতে পারো ; একটি কথা বলবে কি মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব তোমার। অত্যন্ত সিরিয়স ব্যাপার হয়ে গেছে ; রসিকতার সময় নয় এখন।

প্রহ্লাদ : আহা হা। তুমি আগে থেকেই এরকম করছ কেন ? আমিও তো সিরিয়াস হতে জানি ; কী হয়েছে তাই-তো বললে না এখনও। বুঝেছি—

ননী : কি বুঝেছ ? শুনি—

প্রহ্লাদ ঃ নেওয়াখালি না কোন্ ব্যাঙ্কে কোথায় যেন ডিরেক্টর হতে গিয়েছিলে,—ব্যাঙ্ক-ফ্রড কেসে ফেঁসে গেছ ?

ননী ঃ না ; কোনও ব্যাঙ্কে ডিরেক্টর হতে যাই নি—

প্র ঃ তবে ? বেয়ারার চেক দিয়েছিলে ; রেফার টু ড্রয়ার হয়ে ফেরত আসায় ক্রিমিন্যাল কেস করেছে কেউ ?

ননী ঃ না ; চেক দিলে সে চেক ফেরত আসে না আমার !

প্র ঃ তা'লে ? অঃ। বুঝেছি—! বেপাড়ায় মেয়ের পেছনে ঘুরতে গিয়ে এণ্টি রাউডির পাল্লায় পড়েছ ?

ন ঃ না ! কোনও দিন কোনও মেয়ের পেছনে ঘুরি নি ! আমার জীবনে একমাত্র যে মেয়ে,—তার নাম মানসী মল্লিক—

প্র ঃ হুম ! তা'লে মানসীর ব্যাপারেই—

ন ঃ হ্যাঁ ; মানসীর ব্যাপারেই গোলমাল হচ্ছে !

প্র ঃ কী গোলমাল ? ব্যাপারটা কী, বলত—

ন ঃ মানসীর জ্যাঠা বলেছেন যে মাইনে না বাড়লে মানসীর সঙ্গে তিনি আমার বিয়ে দেবেন না—

প্র ঃ মন্দ কথা বলেন নি কিছু ! হাঁ-হাঁ ; সু-প্রস্তাব—

ন ঃ ওদিকে যেখানে চাকরী করি, সেখানে 'সংবাদ' পত্রিকার সম্পাদক গোবর্ধন রায় বলছেন, বিয়ে না করলে মাইনে বাড়বে না—

প্র ঃ হুম ! তা'লে সমস্যা বড় জটিল ! উঁ ?

ন ঃ কী যে করব, ভেবে উঠতে পারছি না—

প্রহ্লাদ কিন্তু ভেবে উঠতে পারে। চরকির মত ঘরের মধ্যে কয়েক পাক দিয়ে ঘুরে এসে চেয়ারে বসেই, চশমাটা নাক থেকে খুলে চোখের সামনে ধরে ; তারপর হাঁ করে ভাপ দেয় ছুটো কাঁচে ; জামা দিয়ে মুছে নিয়ে চশমার কাচ আবার নাকে দেয় ! তারপরে বলে ঃ এতে ভাববার কী আছে ?

ননী ঃ কেন ? যথেষ্ট ভাববার আছে !

প্র ঃ না; নেই! কার্ল মার্কস যেভাবে সমস্যার সমাধান করে গেছেন—

ননী ঃ এর মধ্যে আবার কার্ল মার্কস আসছে কোথা থেকে? কার্ল মার্কস তো এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নি কোথাও—

প্র ঃ আসছে বৈকি ব্রাদার; আলবৎ আসছে! কার্ল মার্কস বলেছেন, 'তিনি যে বিষয়ে কিছু বলেন নি, বুঝতে হবে সে কোন বিষয়ই নয়! এ-বিষয়ে তাঁর প্রথাই সবিশেষ অনুসরণ করা দরকার; আর তাছাড়া কার্ল মার্কসের রাস্তা ধরে এগুলেই তবে তা প্রগতিশীল; না'লে তক্ষুণি তা' প্রতিক্রিয়াশীল যে!

ননী ঃ সে রাস্তাটা কী?

প্র ঃ থিসিস; এন্টি-থিসিস; সিন্-থিসিস—

ননী ঃ মানে?

প্র ঃ সোজা! ধর, মানসীর জ্যাঠা যে বলেছেন মাইনে না বাড়লে মানসীর সঙ্গে তোর বিয়ে নাকচ,—এ হলো থিসিস; আর সংবাদ কাগজের সম্পাদক গোবর্ধনবাবু যে বলেছেন বিয়ে না করলে মাইনে বাড়া অসম্ভব,—এটা হচ্ছে গিয়ে এন্টি-থিসিস; কেমন? তা'লে সিন-থিসিস চাই একটা? সিন-থিসিস হবে এক্ষেত্রে গিয়ে খৈনীগোপাল—

ননী ঃ খৈনীগোপাল কেন?

প্র ঃ তোমার যমজ ভাই খৈনী বিয়ে করেছে বলে—

ননী ঃ তাতে কি হবে?

প্র ঃ তাতেই হবে! তার বউকে বিহার থেকে দিন ছয়েকের জন্যে কলকাতায় নিয়ে এসো—

ননী ঃ তারপর?

প্র ঃ সংবাদ কাগজের গোবর্ধনকে দেখিয়ে দাও তাকে তোমার বউ বলে—

ননী : *Yes*! ফলে গোবর্ধনবাবু মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছেন এবং তখন—

প্র : তখন মানসীর জ্যাঠাকে গিয়ে বলো যে তোমার মাইনে বেড়েছে! তাহলেই—

ননী : হ্যাঁ; তা'লেই সেই তা'লেই মানসীর সঙ্গে আমার বিয়ে হতে আর বাধা নেই।

প্র : হ্যাঁ; লাইন ক্লিয়ার!

ননী : তোর কি বুদ্ধিরে প্রহ্লাদ?

মুখে বলে আর প্রহ্লাদকে গদগদ হয়ে জড়িয়ে ধরে ননী। প্রহ্লাদ বলে : এতক্ষণ তোকে বলাই হয় নি যে কথা বলতে এসেছিলাম—

ননী : বলতে হবে না; নিয়ে যা,—পাঁচটা টাকা ধার চাই তো?

প্র : কি বুদ্ধি তোর ননী? এই কথা বলে আর ননীকে গদগদ হয়ে জড়িয়ে ধরে প্রহ্লাদ!

কিন্তু খৈনীগোপালকে বোঝানো কি চাট্রিখানি ব্যাপার? বই ধার চাইলেই লোকে বলে আজকাল আর ধার দেয় না,—তো এ বলে বউ ধার চাওয়া। খৈনী প্রথম যে আপত্তি তোলে তাই নাকচ করতেই জিব বেরিয়ে যায় তার যমজ ভাই ননীগোপাল দে ডবল বি. এ-র।

খৈনী : এ কখনো হয়? তোমার-আমার চেহারা হুবহু এক; আমার বউ যদি গুলিয়ে ফেলে—

ননী : তুই কি পাগল হলি রে খৈনী? আমরা তুজন একসঙ্গে থাকলে গুলিয়ে যাবার ভয় ছিলো; এ তো তোর বউ জেনেই যাবে যে সে তার স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় যাচ্ছে না; যাচ্ছে স্বামীর ভায়ের সঙ্গে!

খৈনী : কিন্তু ভয় তাতেও নয়; তুমি হঠাৎ বিহারে চলে এলে

আমার বউ-কে কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্যে,—তোমার এত ভৎসাহর কারণটা কি ?

ননী : তাহলে তোকে খুলেই বলি—

খৈনী : হ্যাঁ, খুলে বলো। খুলে বলতে হবে বৈকি। খুলে বললেই আমি তাতে রাজি হবো কিনা সন্দেহ,—আর খুলে না বললে তো কথাই নেই। ব্যাপারটা তো সোজা নয়; তুমি আমার বউকে নিয়ে যেতে চাইছ তোমার সঙ্গে।—

ননী : শোন্। আমি এক বিপদে পড়েছি।

খৈনী : কি বিপদ ?

ননী : আমি বিয়ে করতে চাইছি একটা মেয়েকে—

খৈনী : মেয়েকে ছাড়া আবার কাকে চাইবে ? ঠিকই চেয়েছ। তা' বিপদটা কি ?

ননী : মেয়েটা চাইছে; নাহলে বিয়ে হচ্ছে কি করে ? মেয়েটার জ্যাঠামশাই—

খৈনী : তিনি চাইছেন না ?

ননী : না; তিনিও চাইছেন—

খৈনী : তবে আবার বিপদ্‌টা কোথায় ? এ্যাঁ ? এর মধ্যে তাহলে বিপদ কোথায় ?

ননী : বিপদ হচ্ছে,—মেয়েটার জ্যাঠামশাই বলছেন আমি যা মাইনে পাই, তাতে বিয়ে অসম্ভব। মাইনে বাড়লে তবে বিয়ে হবে—

খৈনী : কিচ্ছু মন্দ বলেন নি; তুমি যা মাইনে পাও তাতে সংসার পাতা চলে না সত্যি! তা' তুমি যেখানে কাজ কর, সেখানে একথা বলো গিয়ে যে, তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ; তোমার মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া দরকার—

ননী : সেই চাকরীর জায়গাতেই মুশকিল—

খৈনী : কি মুশকিল আবার ? বিয়ে করলে চাকরী যাবে ?

ননী : না; আমার যিনি কর্তা,—তিনিই কাগজের সম্পাদক

তিনি একটু পাগলাটে গোছের লোক। তিনি বলছেন, বিয়ে না করলে মাইনে বাড়বে না। ওদিকে যাকে বিয়ে করব তার গার্জেনের শেষ কথা হচ্ছে, মাইনে না বাড়লে বিয়ে দেওয়া অসম্ভব। আমি যে কি বিপদে পড়েছি।

খৈনী : তা' এ বিপদে আমার বউ কি কাজে আসছে শুনি?

ননী : কাজে আসছে। আমার যে মালিক সম্পাদক গোবর্ধন রায় তিনি বদলী হয়ে যাচ্ছেন বোম্বাইতে, আমাদের কাগজের যে অফিস আছে সেইখানে। আমি তোর বউকে দেখিয়ে বলব বিয়ে করে এসেছি।—ব্যাস,—মাইনেও বাড়বে; আমার বিয়েটাও হয়ে যাবে; তোমার ঘরের বউ ঘরে ফিরে আসবে।

খৈনী : উরেঃ বাবা। সে যে বেআইনী ব্যাপার।—এ-প্রস্তাব আমি আমার বউকে করতে পারবো না; বিহারে মানুষ আমার বউ। সাঙ্ঘাতিক গায় জোর—

ননী : আহা হা। বৌমাকে বলতে যাবে কেন? বৌমা জানলে তো কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে। বৌমা আমার সঙ্গে যাবে ছেলে ছুটোকে সঙ্গে নিয়ে, যেন কলকাতা বেড়াতে যাচ্ছে। আমি সব ম্যানেজ করব। ছু'তিন দিনের তো মামলা—

খৈনী : যাক, যা ভালো বোঝ তাই কর। কিন্তু মনে থাকে যেন সাতদিনের মধ্যে যদি আমার বউ আবার ফিরে না আসে তাহ'লে আমাকে যেতে হবে কলকাতায়—

ননীর মুসকিল শুধু খৈনীর ছেলে ছুটোকে নিয়ে। ছেলে ছুটোকে দেখে ফেললেই গোবর্ধনবাবু, সর্বনাশ। যাক, সে পরের কথা পরে। এখন কলকতায় তো যাওয়া যাক।

কলকাতায় পৌঁছেই অফিস। এবং সঙ্গে সঙ্গে গোবর্ধন রায়কে জানানো, যে ননী বিয়ে করে এসেছে।

গোবর্ধনবাবু: এঁ্যা! কাকে পক্ষীতে টের পেলো না,—বি
করে এলে কখন্?

ননী: আজ্ঞ, হঠাৎ হয়ে গেলো,—বিহার গিয়েছিলাম ভাইয়ে
বাড়ীতে, সেইখানেই—

গোঃ বাবু: একেবারে কলকাতা থেকে বিহারে? তোমার পেটে
পেটে এতো ছিলো!—তা' আমাদের খাওয়া দাওয়াটা কবে হচ্ছে—?

ননী: আজ্ঞে, পরিবারের সকলকে এখনও খবর দেওয়া হয় নি
—তাই একটু দেরী হবে বউভাতের ব্যবস্থা করতে,—তবে আপনি ে
বোম্বাই চলে যাবেন,—তা-ই আপনাকে কালই খাইয়ে দিতে চাই—

গোঃ বাবু:—আমি বোম্বাই যাচ্ছি না; এ-সুখবরটা তোমাে
দেওয়াই হয় নি! হ্যাঁ, কাল কেন, আমি আজই যাবো; তোমার ব
মানে তো আমার বৌমা, তার সব ব্যবস্থা হলো কিনা সে তো আমাকেই
দেখতে হবে; তা ছাড়া বৌমার হাতের রান্না,—খাব না?

ননী কোনও রকমে জবাব দেয়: নিশ্চয়! নিশ্চয়!

গোবর্ধন রায় বোম্বাই যাচ্ছেন না, শোনা মাত্রই হয়ে গেে
তার!

ননীর মাইনে বাড়ে। মানসীর জ্যাঠামশাইকে জানায় ননী
মানসীর সঙ্গে ননীগোপালের বিয়ের ব্যবস্থা এগুতে থাকে। ননী মাে
ননীগোপাল দে ডবল বি. এ.। অবিবাহিত প্রতিভাবান যুবক। দু'বা
বি. এ.র পর তৃতীয়বার প্রথম বিয়ে পাশ করবার সম্ভাবনা দেখা দেয়
ননীর মাইনে বাড়ে; কিন্তু তার চেয়েও বেশী যা বাড়ে তা হচ্ছে ভয়
তাকে প্রায় পাগলের মতো ক'রে তুলেছে গোবর্ধন রায়। সকাল-সন্ধে
রাত; অফিসের কাজের সময়টুকু ছাড়া ননীর বাড়ীতেই কাটান তিনি
বৌমা,—বৌমা করে ঢোকেন; আর খেয়ে দেয়ে গল্পো করে যতক্ষ
থাকেন ততক্ষণ বুক ঢিপ ঢিপ করে ননীর ভয়ে। সব চেয়ে মুশকিল

াধায় ছেলে ছুটো ; খৈনীর বউকে গোবর্ধনের সামনে বসিয়ে দিয়েই ফুলে ছুটোকে পাহারা দিয়ে বেড়ায় ননী,—যেন গোবর্ধনের সামনে বেরিয়ে না পড়ে। একদিন কেলেঙ্কারী ওঠে চরমে! ছেলেছুটো কিছুতেই বাগ মানে না ; চেঁচাতে থাকে! ননী শেষকালের ঘরের মধ্যে তাদের বন্ধ করে জানলার গরাদের সঙ্গে হাত পা মুখ সব বেঁধে ফেলে ; তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে তার। কিন্তু গোবর্ধনবাবুকে যাবার সময় দরজা বন্ধ করে ফিরে আসতে না আসতেই খৈনীর বউ-এর চীৎকার : এ কি? এ কি? কে করেছে?

ননী : কী হয়েছে?

খৈনীর বউ : কে ছেলে ছুটোর হাত পা মুখ বন্ধ করে দিয়েছে ঘরের মধ্যে?

ননী : ও? ডাকাত-টাকাত হবে?

খৈঃ বউ : ডাকাত কি? দিনের বেলায় কলকাতা শহরে ডাকাত কি?

ননী : ওরকম আমাদের এখানে হয়! ও তুমি বুঝবে না—

কিন্তু একটু বাদেই ; খৈনীর বউ না বুঝলে কি হবে,—খৈনীর ছেলেপিলে বুঝিয়ে দেয় ভালো করে। বলে দেয় যে ননীই এ কার্য করেছে।

খৈঃ বউ : আপনি করেছেন এই কাজ? কী সর্বনাশ! আপনিই তাহলে ডাকাত?

ননী : না, না! ডাকাত হতে যাব কেন? খেলা করছিলাম ওদের সঙ্গে ডাকাত-পুলিশ খেলা—

খৈঃ বউ : হাত পা মুখ বেঁধে আবার কি রকম খেলা?

ননী : ওরকম আমাদের এখানে হয়! ও তুমি বুঝবে না—বলে ননী আর দাঁড়ায় না ; বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু খৈনীর বউ সঙ্গে সঙ্গে খৈনীকে এক দীর্ঘ পত্র লেখে ; পত্রের শেষে লেখে : "তোমার ভাই লোক ভালো নন। পত্রপাঠ আমাকে

এখান হইতে লইয়া না যাইলে, আম বাবা-মাকে জানাইতে বাধ্য হইব ; তাহার ফল তোমার পক্ষে আশা করি ভালো হইবে না।"

ওদিকে গোবর্ধন রায়ের সঙ্গে আলাপ করেন মানসীর জ্যাঠা। তারপর তাঁকে একদিন বাড়ীতে ডেকে আনেন। একথা সেকথার পর জিজ্ঞেস করেন ননীগোপাল দে ডবল বি, এ, কেউ তাঁর কাগজে কাজ করে কি না এখনও ?

গোবর্ধনবাবু : হ্যাঁ ; করে—

মানসীর জ্যাঠা : তার কি মাইনে বেড়েছে আগে থেকে ?

গোঃ বাবু : হ্যাঁ ; অনেক বেড়েছে। কিন্তু কেন বলুন তো ?

মাঃ জ্যাঠা : আমার ভাইঝির সঙ্গে তার বিয়ে দেব কিনা !

গোঃ বাবু : সে কি ? তার তো বিয়ে হয়ে গেছে—

মাঃ জ্যাঠা : এঁ্যা ?

সব শুনে মানসীর জ্যাঠা বলেন বরাবরই তার সন্দেহ ছিলো ; মানসী শুনে কাঁদতে থাকে।

গোবর্ধন রায়ও শুনে গুম মেরে যান। ননীগোপাল তো এমন ছেলে নয়।

অফিসে ফিরে ননীকে দেখে বলে ওঠেন : ছিঃ ! ছিঃ ! ছিঃ— তোমার এই কাজ ?

ননী বুঝতেই পারে না কি কাজ তার ? কোন্‌টা তার কাজ ? জিজ্ঞেস করে : কি কাজ ?

গোবর্ধন : ন্যাকা ? কোন্ কাজ ?—আবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছে ? একটা মেয়েকে বিয়ে করে সখ মেটে নি ? আবার আরেকজনকে

বিয়ের মতলব ? আর আমার ওরকম লক্ষ্মীপ্রতিমার মত বউ,—সদ্য সধবা হয়েছে!

ননী : আপনি কি মানসীর ওখানে গেছিলেন না কি ?

গোঃ বড্ড অসুবিধা হয়েছে তোমার, না ? সব ফাঁস হয়ে গেল ?

ননী : সর্বনাশ করেছেন—! বলে দৌড়ে বেরুতে যায় ননী ; বাধা দেন গোবর্ধন। ওখানে যেও না ; ওরা সব জেনে গেছে! মানসীর জ্যাঠামশাই তোমাকে মেরে ফেলবেন—!

ননী কোনও বাধা না শুনে বেরিয়ে পড়ে!

যাওয়া মাত্র মানসীর জ্যাঠার চীৎকার : স্কাউণ্ড্রেল! রাস্কেল! ক্রিমিন্যাল—তোমায় আমি জেলে দেব তা জেনো ছোকরা ? তুমি সাপের ল্যাজে পা দিয়েছ ?

ননী : আমি করি নি ; বিশ্বাস করুন,—আমি বিয়ে করি নি। ননী অনেক করে বুঝিয়ে মানসীর জ্যাঠার সন্দেহ ভঞ্জনের জন্যে নিয়ে যায় নিজের বাড়ীতে ; সঙ্গে নিয়ে যায় মানসীকেও!

বাড়ীতে গিয়ে দেখে গোবর্ধন রায়ের সাম্নে খৈনীর বউ মাথা নীচু করে বসে। গোবর্ধনবাবু ননীকে দেখেই লাফিয়ে ওঠেন : স্কাউণ্ড্রেল ? রাস্কেল ? ক্রিমিন্যাল ? এ তোমার বউ নয়—?

মানসীর জ্যাঠা মানসীকে বলেন : কি বলেছিলাম ? গোবর্ধন বাবুর মতো প্রবীণ লোক মিথ্যে বলেছেন ? আর সত্যবাদী যুধিষ্ঠির তোমার এই হতভাগা— ?

ননী : বিশ্বাস করুন,—ও আমার স্ত্রী নয়—!

গোঃ তাহলে পরের মেয়েকে নিয়ে এসেছ ? কী সর্বনাশ ? দুটো ছেলে পর্যন্ত দেখছি ওই ঘরে খেলা করছে ; তারা কারা তবে ?

মাঃ জ্যাঠা : কী সর্বনাশ ? এর হাতে আমি মানসীকে দিচ্ছিলাম ?

পরের মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে ; তার আবার ছেলে আছে ; একটা নয় ; তুটো—

এমন সময় বাইরে কার গলা শোনা যায় : ননী ? ননী ?

ভেতরে যে এসে ঢোকে তাকে দেখে সবাই চমকে ওঠে ; এ যে আরেক ননীগোপাল ! ননীগোপাল তাকে ডেকে ডুকরে কেঁদে ওঠে : খৈনী,—ভাই ! দেখ কী সর্বনাশ করেছিস তুই আমার ?

খৈনীর বউকে ননী যে নিয়ে এসেছিলো গোবর্ধনবাবুকে বিয়ে করেছে প্রমাণ দিয়ে মাইনে বাড়িয়ে মানসীকে বিয়ে করবে বলে তা পরিষ্কার হতে সময় নেয়। সব শুনে গোবর্ধন বলেন : ইডিয়ট। বলতে কি হয়েছিলো যে মাইনে না বাড়লে তোমার বিয়ে আটকে আছে ?

ননী : আজ্ঞে আপনি যে বলেছিলেন বিয়ে করে বউ না দেখা পর্যন্ত মাইনে বাড়াবেন না !

মাঃ জ্যাঃ আমাকে বলতে কি হয়েছিল যে বিয়ে করলেই মাইনে বাড়বে— ?

ননী : আপনি যে বলেছিলেন মাইনে বাড়ার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত বিয়ে হবে না ?

মানসীর চোখে জলের বদলে হাসি ?

এমন সময় বাইরে আবার ডাক শোনা যায় : মা আমার ! কোথায় তুই ? মা ডাকে কে আবার ? মা ডাকেন খৈনীর শ্বশুর ; সঙ্গে পুলিশ।

ভেতরে না ঢুকেই বাইরে থেকে চীৎকার করেন : মা আমার ! আর তোকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না,—পুলিশ নিয়ে এসেছি আমি !

সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হবার পর পুলিশ চলে যায় বটে। কিন্তু যাবার আগে বলে যায় : আপনাকে আগেই বলেছিলাম, ঘরের

কেলেঙ্কারী বাইরে জানতে দেবেন না ?—এসব ভায়ে ভায়ে ব্যাপার ! কালে কালে কি যে হচ্ছে সব ?

ফুলশয্যার রাত। সবাইকে বিদায় দিয়ে মানসীর কাছে যাবার জন্যে ঘরে ঢুকবে এমন সময় পিলে চমকায় ননীর ! বারান্দায় দাঁড়িয়ে মানসী গদগদ হয়ে কার সঙ্গে কথা বলছে ? এই সেরেছে,—মানসী খৈনীকে ননী বলে গুলিয়েছে !

ননী চীৎকার করতে থাকে : ও নয় ! ও নয় ! ও খৈনী !—এই চেয়ে দেখ—মানসী তাকিয়ে দেখে : ননীর পিঠে-পেটে বড় বড় করে লেখা : ননীগোপাল দে ; ডবল বি. এ !